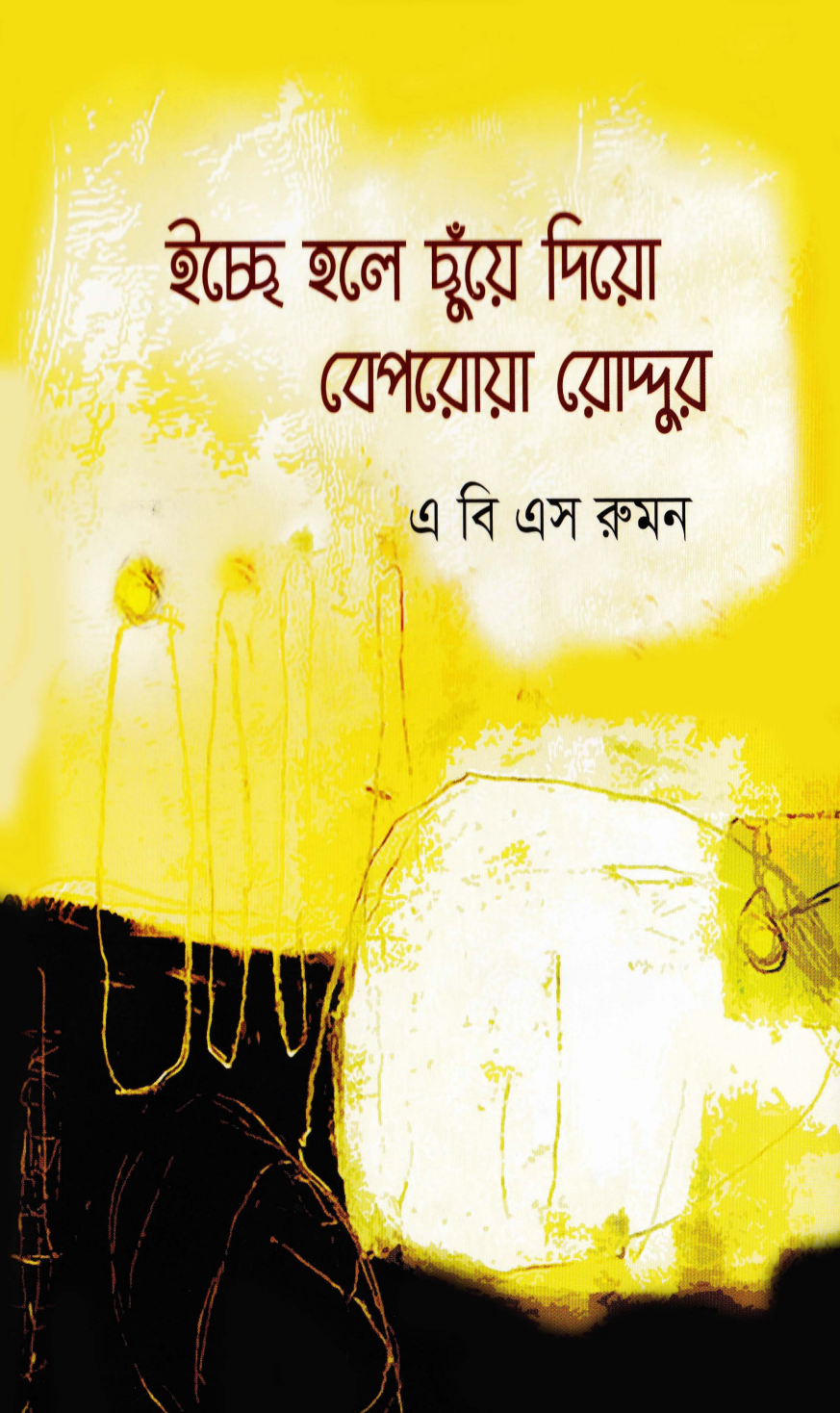
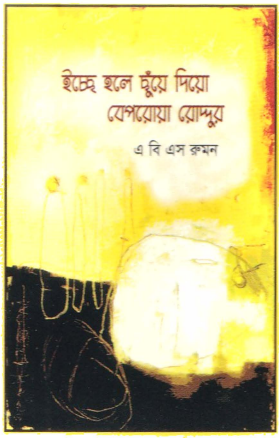
ইচ্ছে হলে ছুঁয়ে দিয়ো বেপরোয়া রোদ্দুর

এ বি এস রুমন





বাংলাদেশের আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের, বিশেষ করে সদ্য পাস করে বিয়ে করা দম্পতিদের এই পৃথিবী ও সমাজের কঠিন, নির্দয় বাস্তবতার কাছে, চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে একসময় যখন মনে হতে থাকে, এই শিক্ষা, এই জীবন কি অর্থহীন? তখনই ভালোবাসার জোয়ারে সব হতাশা, সব কষ্ট ভুলে যাওয়ার গল্প এটি।

বেলার প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে রাশেদ তাকে বিয়ে করে, যদিও এতে বেলার বাবার খুবই আপত্তি ছিল। মধ্যবিত্তের বাবাদের সেই চিরাচরিত সংলাপ 'বেকার একটা ছেলেকে বিয়ে করে জীবনটা নষ্ট করিস না, জীবনে সুখী হতে পারবি না।' কিন্তু ভালোবাসার কাছে জীবনের এসব বাস্তবতা হার মানে। জীবন যাপনে তাদের কষ্ট হলেও তারা অত্যন্ত সুখে দিন কাটায়। তাই তো বেলা আপন মনে বলে, 'বাবা, তুমি ঠিক বলোনি, আমরা সুখী হয়েছি, ভীষণ সুখী।'

এই গল্পের প্রতিটা চরিত্র যেন আপনার দেখা, অতি পরিচিত কেউ! আপনি আবীর, বেলা, রাশেদ, মায়া, রোদদের সাথে মিশে যাবেন, তাদের কথা শুনতে পাবেন...

প্রচ্ছদ নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

ইচ্ছে হলে ছুঁয়ে দিয়ো বেপরোয়া রোদ্দুর

ইচ্ছে হলে ছুঁয়ে দিয়ো বেপরোয়া রোদ্দুর

এ বি এস রুমন

নহলী

নহলী
ইচ্ছে হলে ছুঁয়ে দিয়ো বেপরোয়া রোদ্দুর
এ বি এস রুমন

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ
নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

প্রকাশক
বদরুল মিল্লাত
নহলী
বাড়ি-৮০৮, রোড-১১
অ্যাভেনিউ-৬, ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা।
e-mail : noholipub@gmail.com
www.noholi.com

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
প্রিয়মুখ প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ সলিউশন
৪২ আরামবাগ, ঢাকা।

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

অনলাইন পরিবেশক
facebook.com/noholibooks
priomukh.com/noholi
rokomari.com/noholi

(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; সম্পাদক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটি বা বইটির অংশ বিশেষ যেকোন মাধ্যমে প্রকাশ আইনত ভাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয়)

Icche Hole Chuye Diyo Beporoya Roddur By A B S Rumon
Published By Badrul Millat. Noholi
Cover Design Nirjhor Noishobdo
Price: Tk 250.00/US $12 Only

ISBN: 987-984-93687-1-7

উৎসর্গ

এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করলাম আবীরকে। মনে প্রবল আশা কোনো এক শিশিরভেজা সকালে তার হাতে এই বইটি তুলে দিতে দিতে বলব, 'এতগুলো বসন্ত গেল একটা প্রেম করতে পারলে না ভাই?'

মুখবন্ধ

শেষ বারো বছর আমি 'ইচ্ছে হলে ছুঁয়ে দিও বেপরোয়া রোদ্দুর' উপন্যাসটি লেখার চেষ্টা করেছি। প্রথম যখন উপন্যাসটি লিখি, তখন আমার বয়স মাত্র পনের। সবে স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছি। এসএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক খাতার অনেকগুলো পৃষ্ঠা বেঁচে ছিল। সেগুলো এক জায়গায় করে কালো কালির অক্ষরে মোটা মোটা করে লিখতে শুরু করলাম। উপন্যাসের নাম দিলাম, 'কেবলই রাত হয়ে যায়'। যদিও রাত হওয়ার সত্যি কোনো কারণ ছিল কিনা আমার জানা নেই। ওই বয়সে কী লিখেছিলাম সেসব কল্পনা করলে এখনো লজ্জা লাগে। ভাগ্যিস, সেসব আমারই গোপন, অন্যরা জানে না।

উপন্যাস লেখা শুরু করার কিছুদিন পর খেয়াল করলাম 'কেবলই রাত হয়ে যায়' নামটা ভালো লাগছে না। নাম বদলালাম, নাম দিলাম, 'কাচের ছবি'। কেবল বদলালো না পাঁচজন মূল চরিত্রের নাম– রাশেদ, রোদ, আবীর, বেলা আর মায়া। দিনে দিনে ওরা আমার আপন হয়ে উঠল। আমি রাস্তায় হাঁটি, আবীর যেন আমার পাশে হাঁটে, আমি ঘুমাতে যাই মায়া আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। আমি পরীক্ষায় খারাপ করি, রাশেদ আমায় উৎসাহ দেয়, আমি অসুস্থ হই বেলা আমায় সাহস জোগায়। ওরা আর কল্পনা থাকে না, দিনে দিনে আমার অস্তিত্বে পরিণত হয়।

'কেবলই রাত হয়ে যায়' বা 'কাচের ছবি' যে নামেই ডাকি না কেন, উপন্যাসটি আমি শেষ করেছিলাম। মনে বড় আশা, একদিন বড় হব, এই উপন্যাস প্রকাশ করব। লজ্জা করে সেটা কাউকে দেখালাম না, লুকিয়ে রাখলাম।

সময় বাড়তে থাকল, আমিও বড় হতে থাকলাম। আমার ভুলো মন। উপন্যাসটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলাম বেমালুম ভুলে গেলাম। পুরনো কাগজপত্রের ভিড়ে একদিন উপন্যাসটি পেয়ে আবার পড়তে শুরু করলাম। ততদিনে আমি কলেজ শেষ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য লেখাপড়া করছি। খুব গোপনে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেদিন ব্যবহারিক খাতার কাগজে কাচা হাতের লেখা সেই উপন্যাসটি গড়াই নদীতে ভাসিয়ে দেই। মনকে বলি, একদিন বড় হব, ভাষার ওপর দক্ষতা আসবে, সাহিত্যের প্রতি ধারণা জন্মাবে, বানান ভুল কমে আসবে, সেদিন লিখব, অবশ্যই লিখব।

পরের নয় বছর আমি বিভিন্ন সময় উপন্যাসটি লেখার চেষ্টা করেছি, লিখতে পারিনি। প্রতিবার এক-দুই পর্ব লিখি আর এগোনো হয় না। মূল কাহিনি ঠিক রেখে দিনে দিনে উপন্যাস একটু একটু করে বদলাতে থাকে। আমার বয়স বাড়ে, আমার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রদের বয়স বাড়ে। কী আজব!

এক সময় আশা ছেড়ে দিলাম। এসব উপন্যাস, সাহিত্য আমার কর্ম নয়। আমি বরং পাঠক হয়েই থাকি, শঙ্খনীল কারাগার পড়ে কাঁদি, চাঁদের পাহাড় পড়ে কালহারি মরুভূমিতে হারিয়ে যাই, সেই ভালো।

২০১৭ সালের কোনো এক সোনালি সন্ধ্যা। আর সবার সঙ্গে কথা হচ্ছিল বই নিয়ে। হুমাইরা মিম বলল, 'রুমন ভাই, এই গল্পটা পড়েন।'

নিশাত রহমানের অসাধারণ ছোটগল্প 'চিঠি ও অন্যান্য' পড়ে আমার ভেতরের লেখক মন আবার জেগে উঠল। বহুদিন পর আমি লিখলাম, 'বেলার মন ভীষণ খারাপ। রাশেদের জ্বর কমছে না...' প্রথম পর্ব শেষ করতে লেগে গেল এক সপ্তাহ। মনে তখনো তীব্র সন্দেহ আমি হয়তো পারব না। আগেও তো এক-দুই পর্ব লিখেছি, তারপর এগোইনি।

লজ্জাকে একপাশে সরিয়ে প্রথম পর্ব পড়তে দিলাম ভাবী শাদিয়া সিরাজকে, বন্ধু ঋতুকে, বোন মিতু, রিতু, শশী, শ্যামলীকে। মানুষ উৎসাহ দেয়, তারা করল বল প্রয়োগ, দিল হুমকি। লেখা যেন শেষ করি কিংবা পরের পর্ব যেন দ্রুত পাই। হুমকি আর বল প্রয়োগকে বলে পরিণত করে আমি ধীরে ধীরে লেখা শেষ করলাম। ততদিনে চলে গেছে আরো সাত মাস। এই সাত মাসে নিশাত রহমানের সঙ্গে কথা হয়েছে। তার অনুমতি নিয়ে তার গল্পের দুয়েক লাইন উপন্যাসে ব্যবহার করেছি। আমি নিশাত রহমানের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। যার লেখা পড়ে আমি সাহস করে লিখে বই প্রকাশ করে ফেললাম সেই তিনি লেখেন না, ভাবা যায়!

উপন্যাসটির বেটা রিডিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন প্রিয় লেখক ও সমাজসেবক বদরুল মিল্লাত স্যার। অসাধারণ মনের এই সাধারণ হয়ে থাকা মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

কৃতজ্ঞতা রইল সোমা, মাইদুল, জয়ীতা, সায়িম, কেয়া, সাদিয়া, রিমি, শাফিন, সারা, শাহরিয়ার, দিপা, রিয়া, নীলা, সোহেলুজ্জামান ভাইয়া, গাজী, অমিতাভ, রিমা, তপোতি, খাদিজা, মাফিয়া মালিক, রানী মুখার্জী, নাঈম, মিম, বিথি, বিপা, স্নিগ্ধা, মণিকা, বিলতু, নিগার, আশিক, রিয়াদ ভাই, মাইশা, লুইজিনা, শেফা, সোহেল নূর, সাবরিনা, জুঁই, রামিন, ইমরান, ডাক্তার সাগর এবং রায়হান ভাইসহ আরো অনেকের প্রতি। যারা বিভিন্ন সময় সঙ্গ না দিলে, সাহস না জোগালে বইটি হয়তো প্রকাশ হতো না। সবকিছুর পর প্রথম উপন্যাসটি কেমন হলো আমার জানা নেই। সেটা বরং পাঠকই বিচার করবেন।

এ বি এস রুমন
বটতৈল, কুষ্টিয়া
৩০ এপ্রিল, ২০১৮

১

বেলার মন ভীষণ খারাপ। রাশেদের জ্বর কমছে না, কাশিও বেড়েছে। সারাক্ষণ খুকখুক করে কাশতে থাকে। কাশতে কাশতে চোখ লাল হয়ে যায়। বেলার সামনাসামনি হলেই কেবল মুখ হাসি হাসি করে কাশি লুকানোর চেষ্টা করে, লাভ হয় না।

বছরের এই সময়টা প্রচণ্ড যন্ত্রণার। গায়ে কাঁথা নিলে গরম লাগে, ঘামতে থাকে। না নিলে শীত লাগে, কাঁপতে থাকে। পুরোপুরি শীত না আসা পর্যন্ত শরীর ভালো হবে না। বেলা ওষুধ ওষুধ করে পাগল করে দেয়। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে বসে থাকে। রাশেদ বড্ড হতাশ হয়। সামান্য জ্বরই তো, সামান্য জ্বরে আঠাশ বছর বয়সে কিছু হয় নাকি? এই পাগল মেয়েকে কে বোঝাবে!

রাশেদ নিঃশব্দে খাট থেকে নামে। বেলার মাথার পাশের জানালা অল্প খোলা। গভীর রাতের তীব্র অন্ধকার কাটতে শুরু করেছে। ওর মুখে ভোরের নরম আলো, সাক্ষাৎ অপ্সরা। কুণ্ডলী পাকিয়ে শিশুদের মতো চুপচাপ ঘুমোচ্ছে। ওর চুল অগোছালো, খোলা চুল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। ফর্সা পিঠে কালো তিল উঁকি দিচ্ছে। যেন কাছে ডাকার চুম্বকীয় অস্ত্র। রাশেদের ইচ্ছা হয় ছুঁয়ে দিতে, একটা চুমু দিতে। বেলার ঘুম পাতলা, সহজেই জেগে ওঠে। একবার জাগলে আর ঘুম আসতে চায় না। সারাক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে থাকে।

রাশেদ ওর গায়ে কাঁথা টেনে দিয়ে অন্ধকারে পানির গ্লাস হাতড়ায়। প্রায় রাতেই তৃষ্ণায় ঘুম ভেঙে যায়। পানি পানি বলে হাঁসফাঁস করতে থাকে। হাতের কাছেই টেবিল। রোজ সন্ধ্যায় পানিভর্তি গ্লাস রেখে দেয় বেলা। পরিচিত বিছানা, পরিচিত টেবিল, তবু খুঁজে পেতে সময় লাগে। লাইট জ্বালালেই হয়, ইচ্ছা করে না। হঠাৎ আলো চোখে পড়লে বেলার ঘুম ভেঙে যাবে। ঘুম ভেঙে গেলে সারারাত জেগে থাকবে। রাশেদের এ সমস্যা নেই। তীব্র আলো কিংবা উচ্চশব্দে ঘুমোতে পারে, রোদও তাই। বাসের মধ্যে প্রচণ্ড গরমে সবাই যখন

ছটফট করে, তখন একটু বসার জায়গা পেলেই দিব্যি ঘুমিয়ে নেয়।

রাশেদ সাবধানে দরজা খুলে বাইরে বের হয়। সুনসান নীরবতা। একটা-দুইটা চড়ুই পাখি নিঃশব্দে উড়ে চলেছে। কুয়াশারা রোজ রোজ প্রকৃতির দখল নিতে চায়, লাভ হয় না। ভোরের আলো আসলেই তড়িঘড়ি করে পালাতে হয়। কোটি বছরের পুরনো যুদ্ধ, পুরনো বিজেতা, পুরনো বিজিত। দর্শক কেবল বদলে যায়। চক্র ঘুরতে থাকে, সময় বদলায়। জীবন আর মৃত্যুর খেলা চলে। একদল মনে রাখে, একদল রাখে না।

রান্নাঘরে আলো জ্বলছে, কেউ নেই। বেলা নেভাতে ভুলে গেছে, ও প্রায়ই ভুলে যায়। আলো নিভিয়ে রাশেদ নিঃশব্দে চা বানায়। চা নিয়ে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে। একসময় বাবা এই চেয়ারে বসতেন, মা চা বানিয়ে আনতেন। সময় বদলে গেছে, চরিত্র বদলে গেছে। বাবা-মা নেই, চেয়ারগুলো রয়ে গেছে। জীবন হয়তো এমনই; পাখি উড়ে যায়, পালক পড়ে থাকে। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো, এখন তাও হয় না। মনে হয় এই তো স্বাভাবিক, সব ঠিক আছে। সময় বড় অদ্ভুত বেইমান, মৃত্যুকেও ভুলিয়ে দেয়।

চেয়ার ছেড়ে রাশেদ উঠে দাঁড়ায়। বারান্দার ঠিক পাশেই করমচা গাছ। বেলার গাছ লাগানোর বাতিক। বছর দুই আগে বিয়ের পরপর শখ করে ছোট্ট চারাগাছ লাগিয়েছিল। সেটাই ডালপালা ছড়িয়ে আকাশ ছুঁতে চায়, গ্রিল ভেদ করে বারান্দায় উঁকি দেয়। সারাবছরই গাছটায় ফুল থাকে, ফল ধরে। অতিরিক্ত টক বলে বেলা আর মায়া ছাড়া কেউ ওটার ছায়াও মাড়ায় না। বেলা রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা-দুটো ফল ছিঁড়ে মুখে দেয়। প্রচণ্ড টকে মুখ বিকৃত করে, তাই দেখে রাশেদ হাসে। পাতায় ভোরের শিশির জমে, সেসব ভেঙে দিতে দিতে বেলা গাছটার সঙ্গে কথা বলে। যেন ওটা গাছ নয়, ওর সন্তান। রাশেদ আগ্রহ নিয়ে বেলাকে দেখে, ওর কথাগুলো শোনে।

'খুব দুষ্টু হয়েছিস না! গ্রিল মানছিস না। গ্রিল ভেঙে মাকে দেখতে আসতেই হবে, তাই না পাজি মেয়ে?'

বেলা খানিকক্ষণ চুপ থাকে, যেন ওটা উত্তরে কিছু বলছে। যেটা কেবল ও শুনতে পায় অন্যরা পায় না। খানিক থেমে আবার যোগ করে–

'এত টক কেন তুই? মায়ের সঙ্গে দুষ্টামি রে পাজি মেয়ে? তোকে এত দুষ্টু হতে হবে না। কয়েক সপ্তাহে কী চেহারা করেছিস বল তো! আমার মেয়ে এমন অগোছালো থাকলে চলে, লোকে কী বলবে?'

বেলা কয়েকদিন পরপরই গাছটার বাড়তি ডালপালা ছেঁটে দেয়। পাতার ধুলা পরিষ্কার করে দেয়।

রাশেদ উঠে দাঁড়ায়। রোদের ঘরটায় একবার উঁকি দেয়। ঘর অন্ধকার করে চুপচাপ ঘুমোচ্ছে। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে ও। খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখে রাখে, কাউকে দেখাতে চায় না। ওকে নিয়ে ভীষণ চিন্তা হয় রাশেদের। কিছুতেই পড়তে চায় না। বাবা-মা বেঁচে থাকতে ওকে নিয়ে খুব চিন্তা করতেন। সড়ক দুর্ঘটনায় তারা একসঙ্গে বিদায় নিয়েছেন, সব দুশ্চিন্তার ভার ওর কাঁধে দিয়ে গেছেন। ভেবেছিল বড় হলে বুঝতে শিখবে, তখন নিশ্চয় পড়বে। বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে, সবই মনোযোগ দিয়ে করে কেবল লেখাপড়াই করে না। অনার্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা সামনে। প্রথম দুইবার ফেল করতে করতে কোনোরকমে বেঁচে গেছে। গত দু'বছর খানিক পড়ছিল, এ বছর একদমই পড়েনি। এমন কেন ও!

রাশেদ হাতঘড়ি দেখে, পাঁচটা তেতাল্লিশ। ঘুমোক আরেকটু। চা কাজে দিয়েছে, কাশি কমলেও থেমে যায়নি। রাশেদ উঠানে গিয়ে দাঁড়ায়। উঠান থেকে আকাশ দেখা যায়, আজকে যাচ্ছে না। কুয়াশায় চারপাশ ঢেকে আছে। শীতের কিছু পোশাক কেনা দরকার। রোদের শীত সহ্য হয় না। বাড়তি টাকাও হাতে নেই। বছরের শেষের দিক হওয়ায় টিউশনের ছুটিও সামনে। বাবার রেখে যাওয়া টাকায় যে মুনাফা আসে, তাতে দশদিনও চলতে চায় না। এখন কী হবে!

'শরীর কেমন তোমার?'

রাশেদ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়। বেলা শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে করমচা গাছটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর চুল ভেজা, সাত সকালে গোসল দিয়ে নতুন শাড়ি পরেছে। চোখে কাজল দিয়েছে, কপালে লাল টিপ, হাতে কাচের চুড়ি। রাশেদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, বেশ লাগছে।

আজ কি কোনো বিশেষ দিন, নতুন শাড়ি পরার রহস্য কী! রাশেদ ভাবতে থাকে। আজকের তারিখ মনে করার চেষ্টা করে, মনে পড়ে না। এগারো নাকি তেরো তারিখ গুলিয়ে গেছে। বেলার জন্মদিন, ওদের তৃতীয় বিবাহ বার্ষিকী! কোনোটাই নয়। ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব কষ্ট দিচ্ছে আজকাল।

'শরীর ভালো, সুন্দর লাগছে তোমায়।'

বেলা হাসে, ওর হাসি সুন্দর। হাসলে মুখের ভাঁজ চোখের পাশে তরঙ্গ খেলে যায়। কিছু হাসি নিজেকে আনন্দ দেয় অন্যকেও খুশি করে। বেলার হাসি তেমন– বিশুদ্ধ, পবিত্র, অকৃত্রিম।

'নতুন শাড়ি, রোদ এনেছে, পাগল একটা বুঝলে? বলা নেই কওয়া নেই হুট করে হাতে দিয়ে বলল, ভাবী এই শাড়ি তুমি কাল গোসল দিয়ে পরবে,

তারপর সেজেগুজে আমায় সকাল সকাল ডেকে দেবে, আমি তোমার পরী মুখ দেখে পড়তে বসব। পাগল আর বদলাল না, এতগুলো টাকা খরচ করে ফেলল।'

বেলা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যায়। ধীরপায়ে রাশেদের কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে কপালে হাত দেয়। জ্বর কমেছে নিশ্চয়, ওকে খুশি দেখায়। কোমল একটা উষ্ণতা মেয়েটার শরীরে। যতবার ওকে স্পর্শ করে মনে হয় জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ছুঁয়ে দেখছে, রাশেদ খুন হয়ে যায়।

বেলা হাত ধরে ওকে রোদের ঘরে নিয়ে যায়, রোদ ঘুমোচ্ছে। মাথার কাছে টেবিল ঘড়ি। ঘড়িতে পাঁচটায় অ্যালার্ম ঠিক করা ছিল। এখন ছয়টা বেজে পাঁচ মিনিট। অ্যালার্ম বেজে বন্ধ হয়ে গেছে, রোদ ওঠেনি। বেলা ওকে ডাকতে থাকে, লাভ হয় না। নাম রোদ হলেও প্রথম সকালের রোদের সঙ্গে অলস রোদের কখনো দেখা হয় না। বেলা হাত ধরে রোদকে টেনে তোলে। রাশেদ বেলাকে দেখে। লক্ষ্মী মেয়ে, সবাইকে ভালো রাখতে গিয়ে নিজেকে কত সহজেই না বঞ্চিত করছে। রাশেদ ভেতরে ভেতরে ভাঙতে থাকে। সুখের মতো ব্যথা ওকে তোলপাড় করে দেয়। জীবন বয়ে চলে, পৃথিবীর বয়স বাড়ে আরো একদিন।

২

পরীক্ষা এলেই রোদের মরে যেতে ইচ্ছা হয়। ছেলেটা মেধাবী কিন্তু পড়তে চায় না। মায়া একগাদা নোটপত্র দিয়ে গেছে। ও সিলেবাস, খাতা উল্টেপাল্টে দেখে। মৃত্যুর ইচ্ছা প্রবল হয়। শখ করে গণিতে ভর্তি হয়েছিল। গণিতে সবসময়ই ভালো ছিল ও, ভেবেছিল একটু-আধটু অনুশীলনেই প্রথম হয়ে যাবে। সুনীলের কবিতার মতোই গণিত কথা রাখেনি। একগাদা থিওরির ভিড়ে গণিতের মজা খুঁজে পায় না। মায়া রোজ রোজ না পড়ার জন্য বকাঝকা করে, গালি দেয়। পড়ব পড়ব করে পড়া হতে চায় না। পরীক্ষায় পাঁচ সেট প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। মায়া ছয় সেট প্রশ্নের উত্তর কীভাবে করা যায় তার গাইডলাইন দিয়ে গেছে। কোনো গাইডলাইনে কাজ হবে না, ও বুঝে গেছে।

রোদ ছাদে গিয়ে বসে। চারপাশ কুয়াশার চাদরে ঢাকা। শীত সহ্য হয় না ওর, কুয়াশাও না। সকাল হবে সকালের মতো, চারপাশে আলো থাকবে, রোদ ঝকঝক করবে। শালিক-চড়ুই পাখি ডাকাডাকি করবে। নারকেল গাছের পাতাগুলো বাতাসে নাচবে। এটা কোনো আবহাওয়া হলো? এমন আবহাওয়ায় পড়া যায়!

'কীরে জেমস বন্ড লাফ দিবি নাকি? এখান থেকে লাফ দিয়ে সর্বোচ্চ পা মচকাতে পারে, তাতে উপরওয়ালা পর্যন্ত পৌঁছানো সহজ নয়।'

রোদ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়। আবীরের ঠোঁটে সিগারেট, হাতে টুথ ব্রাশ। মুখ গম্ভীর করে কৌতুক করাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে ও। আবীর রাশেদের বন্ধু। বাবা-মা মারা যাওয়ার আগে দ্বিতীয়তলার কাজ চলছিল, শেষ করে যেতে পারেননি। সেখানের একটা ঘর কোনোরকমে মেরামত করে থাকে আবীর। ও কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। ওর ধর্ম কী, বাবা-মায়ের পরিচয় কী তাও কেউ জানে না। জানতে চাইলে এ-কথা সে-কথা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়।

'লাফ দিলে ভালোই হতো, অল কোয়ায়েট।'

কথাটা বেলাকে বললে দুশ্চিন্তা শুরু করে দিত। একটু পর পর এসে বেঁচে থাকা কত জরুরি কত মজার তা বোঝাত। ওর ঘর থেকে আত্মহত্যা করা যায় এমন সব উপকরণ সরিয়ে রাখত, দরজা লাগিয়ে ঘুমাতে দিত না। নিজে না ঘুমিয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওকে এসে দেখে যেত। আবীর নির্বিকার আগুনে ঘি ঢালে, হাই তুলতে তুলতে বলে,

'আমার পরিচিত একটা জায়গা আছে, ওখান থেকে লাফ দিতে পারিস, পরপার নিশ্চিত। লাফ দেয়ার আগে আমার ২০০ টাকা ফেরত দিয়ে যাস।'

রোদের ভ্রু কুঁচকে যায়, ভেতরের রাগ কখনই লুকাতে পারে না ও। ২০০ টাকার ব্যাপার দু'বছর পার হয়েছে। যতবার শোধ দিতে যায় আবীর বলে, 'থাক, পরে দিস।'

'ইয়ার্কি করিস না তো ভাইয়া।'

আবীর রোদের পাশে এসে বসে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আকাশের দিকে তাকায়। শীতের প্রথম কুয়াশা আর সিগারেটের ধোঁয়া একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আনন্দ নিয়ে দেখতে থাকে। আজকের সকালটা সুন্দর, আবীর মনে মনে ভাবে, সারা বছর এমন কেন থাকে না!

'মন খারাপ কেন, কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'ঝগড়া করেছিস মায়ার সাথে, নাকি বকা খেয়েছিস?'

রোদ সন্দেহ নিয়ে আবীরের চোখে তাকায়। ওর গতিবিধি সন্দেহজনক। আশপাশ দিয়ে ঢিল ছুড়ে সবসময় গোপন কথাগুলো বের করার চেষ্টা করে।

'না, বকা খাব কেন?'

'তাহলে?'

'তাহলে কী!'

'মুখ বাঁদরের মতো করে রেখেছিস কেন?'

রোদ বিরক্তি নিয়ে পা নাচাতে থাকে। আজকের দিনটাই কুফা, মনে মনে বলে।

'আর বলিস না, পড়তে ভালো লাগে না।'

'তাহলে ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে ব্যবসা শুরু কর।'

'না, লেখাপড়া ছাড়া যাবে না, অন্য বুদ্ধি থাকলে দে।'

'হুম, তোকে একটা বুদ্ধি অবশ্য দিতে পারি।'

'কী?'

আবীর সিগারেট শূন্যে ছুড়ে ফেলে বাম হাত দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা

মুখ চুলকায়।

'শুনলাম বটতলার মোড়ে নাকি একটা পাগলী বসেছে।'

'সে বসতেই পারে।'

'তা তো পারে কিন্তু লোকজন বলাবলি করছে পাগলী নাকি যেনতেন কেউ নয়। সে যা বলছে তাই ঘটছে।'

'ধুর, তাই হয় নাকি, সকাল সকাল যত সব আজগুবি কথা।'

আবীর রোদের তাচ্ছিল্য গায়ে মাখে না। ও জানে রোদ ওর কোনো কথাই বিশ্বাস করে না, আবার অবিশ্বাসও করে না।

'মুরব্বিরা ঠিকই বলেন, গরিবের কথা বাসি হলে ফলে। এখন বিশ্বাস করবি না কিন্তু সময় গেলে সাধন হবে না রে পাগলা।'

রোদ উঠে দাঁড়ায়, ওর শীত শীত লাগছে। বসে বসে এই মরা আবহাওয়া দেখার চেয়ে ঘুমানো ভালো। আবীর হাল ছাড়ে না, বলে চলে–

'ভেবে দেখ রোদ, ধর পাগলীর কোনো ক্ষমতা নেই, তাতে তোর কিছু যাবে আসবে না কিন্তু যদি কোনো ক্ষমতা থাকে তবে কী দারুণ মিরাকল ঘটে যাবে বুঝতে পেরেছিস?'

'শোন ভাইয়া, এসব মিরাকল-ফিরাকল বলে কিছু হয় না।'

'হুম, প্রথম প্রথম তোর মতো আমিও অবিশ্বাস করেছিলাম, ঘটনা সত্য কিনা জানার লোভ হলো। পাগলীর কাছে আবার এমনি যাওয়া বারণ। পাউরুটি আর মিনারেল ওয়াটার নিতে হয়।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী গেলাম নিয়ে। গতকাল পর্যন্ত আমি তোর মতোই ভেবেছিলাম সব ভুয়া। আজ ঘুম থেকে উঠে আমি তো অবাক।'

'কেন, অবাক কেন?'

'আর বলিস না, পাগলীর কাছে যাওয়ার পর বলল, কী চাস! কী চাস! আমি তো কোনোকিছু ঠিক করে যাইনি। বললাম, কিছু চাই না, আপনার মনে যা আছে বলেন, রাত হয়েছে বাড়ি যাব।'

'তারপর?'

আবীর হাই তুলতে তুলতে বলল।

'তারপরই তো ঘটল আসল ঘটনা। পাগলী বলল...'

'কী বলল?'

'বলল, কাল সকালে আকাশ নাইমা আইবো, সাদা কাফন পইরা নাইমা আইবো। ভেবে দেখ রোদ, কুয়াশা পড়া মানে তো এক অর্থে আকাশ নেমেই

আসা তাই না? আবার কুয়াশাকে সাদা কাফন তো বলাই যায়। তুই কবি মানুষ, তুই এসব অন্যদের থেকে ভালো বুঝবি।'

রোদ বিরক্ত হয়ে বলে,

'ধুর, তুই আর তোর পাগলী দুইটাই বেকুব শ্রেণির ফাউল। কুয়াশার মতো কুয়াশা পড়ছে তারও শান্তি নেই। সাদা কাফন, আকাশ নেমে আসা, উদ্ভট সব কথাবার্তা।'

রোদ হনহন করে হাঁটা ধরে। আবীর গম্ভীর মুখে বলে,

'গেলে কিন্তু উপকার পেতি রোদ, ভাই বলেই বলছি। আর শোন পাউরুটি সম্ভব হলে গরম নিস, কাজে দেবে। টাকা না থাকলে আমার কাছ থেকে ধার নিতে পারিস একশো, মুনাফাসহ আগের টাকা মিলিয়ে তিনশো পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।'

রোদ বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে বলতে নিচে চলে যায়। মিশন রোদ আন-সাকসেসফুল। বেলা, রাশেদ কাউকে বলা যাবে না। ওরা হেসেই উড়িয়ে দেবে। মায়া! ওকেও না। রোদ মনে মনে বকেছে, মায়া মুখের ওপর দু'কথা শুনিয়ে দেবে। অন্য কাউকে গল্পটা বলা দরকার। আবীর আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্রাশ মুখে নিয়ে দাঁতের এপাশ-ওপাশ ঘষতে থাকে। ব্রাশটা পুরনো হয়েছে, বদলানো দরকার।

৩

লোহা পেটানোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মায়া মিত্রের। দুপুরে ঘুম পায় না ওর, আজ পেয়েছিল। হুট করে ঘুম ভাঙায় মাথা চিনচিন করছে, অস্বস্তি হচ্ছে। মায়া ঘড়ি দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়ায়। একটা বাহান্ন।

বাইরে ঝকঝকে রোদে সকালের কুয়াশা কেটে গেছে। হঠাৎ করে তাকালে তীব্র আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। নির্মল নীল আকাশে দূরে এক টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, নারকেল গাছের পাতাগুলো মৃদু মৃদু কাঁপছে। নিম গাছের ফুলগুলো বাতাসে টিপটিপ নাচছে, ঝরে পড়ছে। জানালার পাশে সুপারি গাছ। দুটো কাঠবিড়ালি গাছটায় বাসা বেঁধেছে। ওরা এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আর কিছু একটা মুখে দিচ্ছে। মায়া আগ্রহ নিয়ে কাঠবিড়ালি দেখে। মা কাঠবিড়ালির বুকের সঙ্গে ছোট ছোট তিনটা বাচ্চা। মা কাঠবিড়ালি বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছে, বাবা কাঠবিড়ালি সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে। মায়ার চোখ আনন্দে ছলছল করে ওঠে। কী সুন্দর! একটা দোয়েল পাখি কোথা থেকে যেন ডাকছে। মন ভালো করা উষ্ণ দুপুর। ইশ! সব দুপুর কেন এমন হয় না? কিছু জিনিস একা দেখে উপভোগ করা যায় না, সঙ্গী লাগে।

ঠাকুরঘরে আলো জ্বলছে, মা জ্বালিয়ে রেখেছেন। ঠাকুর আছেন, মা নেই। মার অন্ধকার ভীতি প্রবল, যে ঘরে যান আলো জ্বালিয়ে রাখেন। মায়া মাকে খোঁজে, কোথাও নেই। ও মা মা বলে জোরে চিৎকার দেয়। মা রান্নাঘর থেকে তড়িঘড়ি করে উঠে আসেন। কাঠবিড়ালি দুটো চিৎকার শুনে পালিয়ে গেছে। মায়ার নিজেকে অপরাধী মনে হয়, ভালো মন বিষাদে ছেয়ে যায়। ছাদে গিয়ে খুঁজেও লাভ হয় না, সমস্ত ছাদ খালি।

'খুঁজে লাভ নেই, তোর ম্যাথমেটিশিয়ান নামাজে।'

মায়া পাশে ফিরে দেখে। মায়াদের পাশের বাড়ি রোদদের। দুটো ছাদ পাশাপাশি। এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে সহজেই না লাফিয়ে পার হওয়া যায়।

খবরের কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে আবীর মায়ার চোখে তাকায়। দুপুরের সূর্য মায়ার ফর্সা মুখে এসে পড়েছে। ঠোঁটের নিচের তিল গোল মুখটাকে আরো মায়াময় করেছে। ওকে সুন্দর দেখায়। ও কোনোকিছুই ধরে রাখতে পারে না, না আনন্দ না বিষাদ।

'আমার ম্যাথমেটিশিয়ান মানে কী?'

আবীরের মুখ গম্ভীর, বাম হাতের উল্টা পাশ মুখে চাপতে চাপতে হাই তোলে।

'মানে তোর রোদ।'

'মানে?'

'আচ্ছা, বাদ দে। খুঁজছিস কী?'

মায়ার ভ্রু কুঁচকে বিরক্তি নিয়ে আবীরকে দেখছে। সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জলভাবে কথার হুল ফোঁটায় আবীর। মায়ার বহুদিনের ইচ্ছা ওকে কঠিন একটা শিক্ষা দেয়ার। দিন দিন ইচ্ছা লক্ষ্যের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। বসন্ত যায়, বসন্ত আসে, তবু ওকে শিক্ষা দেয়ার উপায় পায় না।

'তোকে বলে লাভ নেই। তোকে বলার চেয়ে দেয়ালকে বলা ভালো।'

'আচ্ছা দেয়ালকে বল আমিও শুনি।'

'না, বলব না।'

'আচ্ছা আমাকেই বল, আমি তো তোর রাখি বাঁধা ভাই, তাই না? অবশ্য শেষ তিনদিনে চারবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিস পরের দীপাবলিতে আমাকে আর রাখি পরাবি না।'

মায়া আবীরের পাশে এসে দাঁড়ায়।

'সর, বসব।'

সমস্ত ছাদ খালি, তবু আবীর যেখানে বসেছিল সেখানেই সবসময় বসতে হবে ওকে। আবীর সরে বসে। পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে মায়া। রোদ্দুর সরাসরি পিঠে এসে লাগছে। কোমল উষ্ণতা বেশ লাগছে, শীত বোধ হয় এসেই গেল।

'দাদা।'

'বল।'

'আজকের দুপুরটা খুব সুন্দর তাই না?'

'ভালোই মোটামুটি, সকালটা বেশি সুন্দর ছিল।'

'একটা কাঠবিড়ালি সুপারি গাছের পাতার ওপর বসেছিল, দেখেছিস?'

'না।'

'দেখে দিতে পারবি?'

'না।'

'এবার দীপাবলিতে সত্যি তোকে আর রাখি পরাব না, তুই আমার ভাই না।'

আবীর পত্রিকা পাশে সরিয়ে রাখে।

'কাঠবিড়ালির ব্যাপারে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে একজন তোকে সাহায্য করতে পারে।'

'কে?'

'বটতলার মোড়ে এক পাগলী এসেছে, সে যা বলছে তাই হচ্ছে।'

'সাদা কাফন পইরা নাইমা আইবো বলছে আর আকাশ থেকে হুরপরী নেমে আসছে?'

'তুই তো দেখি সবই জানিস।'

মায়া নড়েচড়ে বসে। পাগলীর ব্যাপারে আবীর বেশি বেশি করছে। গত কয়েকদিন ও সামনে যাকে যাকে পেয়েছে পাগলীর ব্যাপারে গুজব ছড়িয়েছে। ওকে কঠিন কিছু বলা দরকার। মায়া গলা পরিষ্কার করে।

'দাদা, তোর উদ্দেশ্য কী বল তো?'

'আমার আবার কী উদ্দেশ্য থাকবে?'

'তুই গুজব ছড়াচ্ছিস কেন?'

'দেখ মায়া তুই যা ভাবছিস ব্যাপার ঠিক তা না। সাইফুল চাচার ছেলে দুই মাস হলো বাড়িতে ফিরত না, তারপর...'

'তুই যে কত বড় ভণ্ড কেউ না জানলেও আমি জানি না তা ভাবিস না। তোর বিশাল কোনো উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য কী ধরতে পারছি না।'

'তুই অযথাই একজন ভদ্রলোককে ভণ্ড বলছিস, গেলে কিন্তু উপকার পেতি। একবার সত্যতা যাচাই করে দেখতি তারপর না হয় বলতি ভুয়া।'

মায়া জোরে হেসে ওঠে, ওর কণ্ঠে তাচ্ছিল্য।

'ভদ্রলোক! হি হি হি, ভালোই বলেছিস।'

আবীর মায়ার অপমান গায়ে মাখে না। মায়া এমনই, অপমান করবে আবার প্রশংসাও করবে। ওকে গুরুত্ব না দেয়া ভালো।

'ভদ্রলোক না হলেও ভণ্ড কিন্তু নই।'

'উউহ, ভণ্ড না তো কী? ঈশ্বর বিশ্বাস করিস না আবার পাগলীর কেরামতি বিশ্বাস করিস, ফাজিল লোক।'

'জগতে ভালো মানুষের দাম নেই। দেখ, পাগলীর যদি ক্ষমতা না থাকে

তবে তাতে তোর বা আমার কিছু যাবে আসবে না কিন্তু যদি থাকে, তবে ভেবে দেখ পরে কিন্তু পস্তাতে হবে।'

'চুপ, একদম চুপ।'

'আমি চুপ থাকলে তো আর বুদ্ধিমানরা চুপ থাকবে না। তারা ঠিক কামেল পাগলী মাকে খুঁজে নেবে।'

মায়া উঠে দাঁড়ায়, ওর ভীষণ রাগ হচ্ছে। কিছু একটা করা দরকার কিন্তু প্রচণ্ড রাগে ও দিশা খুঁজে পাচ্ছে না।

'আমি যদি একটা হাতুড়ি তোর মাথায় মেরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেই, তবে তার শাস্তি কী হবে?'

'বেশি না, সর্বোচ্চ একবেলা ফাঁসি থেকে সর্বনিম্ন চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড। আদালতে অবশ্য নয় মাসে বছর, মারবি নাকি?'

'মারব, অবশ্যই মারব।'

'মারার আগে তোর কাছে তিনশো টাকা পাই কিন্তু মায়া, ওটা শোধ করে দিস। পরের জন্মে কিছু হিসাব কমবে।'

'ধার মানে? জোর করে জমা রাখলি, টাকা ফেরত দিতে গেলে তো নিস না আবার বলিস ধার।'

'মাকে তো মা-ই ডাকতে হয়, ধারকে ধার।'

'দাঁড়া এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।'

'ধার দিয়েছিলাম সকালে এখন তো দুপুর, শোধ সকালে নেব।'

'না এক্ষুনি নিবি।'

'দিতে চাইলে মুনাফাসহ দিস, মুনাফার টাকা বরং পাগলীকে দিতে পারিস। এক বোতল মিনারেল ওয়াটার...'

মায়া আর রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার দেয়।

'চুপ, একদম চুপ!'

'আচ্ছা চুপ!'

মায়া হনহন করে হাঁটা ধরে। গজগজ করে মুখে যা আসে তাই বলে।

'তুই একটা কুত্তা, মকবুলদের বাড়ির সামনের বেয়াদব কুত্তা।'

'মকবুলদের বাড়ির সামনে কুত্তা তো দুইটা, আমি কোনটা?'

'পশম ওঠাটা তুই, আর আরেকটা তোর বউ।'

৪

বাবা-মা যেদিন মারা গেলেন রাশেদ সেদিন বাড়িতে ছিল না। সেদিন ছিল শুক্রবার, আজো তাই। বাবা-মায়ের লাশ পাশাপাশি বারান্দায় রাখা ছিল। পাঁচ বছর পার হয়েছে তবু মনে হয় এই তো সেদিন। লাশ যেখানে রাখা ছিল, সেখান দিয়ে হাঁটতে পারে না ও। মনে হয় বাবা-মা শুয়ে আছেন, গায়ে পা লেগে যাবে।

রাশেদ প্রতি শুক্রবার বাবা-মায়ের কবরের পাশে দাঁড়ায়। মায়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করে, মনে পড়ে না। রাশেদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, চোখের আড়াল হলে খুব কাছের মানুষগুলোর চেহারাও মনে করতে পারে না। দূরে বেলা দাঁড়িয়ে, মৃত্যু ছাড়া গোরস্তানটিতে মেয়েদের প্রবেশের অনুমতি নেই। রাশেদের খুব খালি খালি লাগে। বুকে জমে থাকা দীর্ঘশ্বাস বের করে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘ করেছে পশ্চিমে, অসময়ে কান্নার মতো স্বরে ডাহুক পাখি ডাকছে। রাশেদ বিড়বিড় করে বাবা-মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি কামনা করে। প্রার্থনা শেষে ধীরপায়ে কবরের খুব কাছে যায়। এপিটাফ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে। যেন এপিটাফ নয় মাকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। এপিটাফে আট লাইনের কবিতা লেখা।

ওরা আসে আমার শান্তির পথ ধরে,
ওরা আসে বৃষ্টির আঙিনার পরে,
আমি ক্লান্তির মায়া ছেড়ে স্বপ্ন খোয়াই,
আগুনহীন উত্তাপ, মরুভূমির ছোঁয়ায়।
ওরা আসে সবকিছু জেনে তবু,
ওরা আসে ঝড় নামা কোনো প্রভু,
আমি তো ধোঁয়াশা হয়ে উবে উবে যাই,
হায় খোদা, রহমান, কোথায় কোথায়!!

মা ভালো কবিতা লিখতেন। লজ্জা করে কাউকে দেখাতেন না, বাবাকেও

না। মায়ের ইনসমনিয়া ছিল। গভীর রাতে রাশেদের ঘরে আলো জ্বলছে দেখলে খুশি হতেন। ছেলের সঙ্গে রাত জেগে গল্প করতেন, কবিতা শোনাতেন। রাশেদ মায়ের গুণ পায়নি, রোদ পেয়েছে। খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখে রাখে ও, কাউকে দেখায় না।

বাবা-মা মারা যাওয়ার পর রোদ সারাদিন গোরস্তানে এসে বসে থাকত, কাঁদত। সময় মৃত্যুযন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। রোদ এখন এ পথে আসে না, রাশেদও জোর করে না।

চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে রাশেদের। দূরে বেলা দাঁড়িয়ে, ভালোই হয়েছে। রাশেদ আস্তে করে চোখ মোছে। নিজের দুর্বলতা কাউকে দেখাতে চায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরেকবার আকাশের দিকে তাকায়। মেঘ দ্রুত তেড়ে আসছে, বৃষ্টি হবে নিশ্চয়ই। মা বৃষ্টি ভালোবাসতেন, বেলাও তাই। যখনই বৃষ্টি হোক ভেজা চাই। ভিজতে ভিজতে শীতে কাঁপে তবু উঠতে চায় না। এমন কেন করে!

রাশেদ ধীরপায়ে গোরস্তান ছেড়ে বাইরে বের হয়, চারপাশে তাকায়। শীতল একটা গন্ধ বাতাসে। আশপাশে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে হয়তো, চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। কেমন ভুতুড়ে আর মন খারাপ করা পরিবেশ। বেলা রাশেদের হাত ধরে। নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে বাবা মায়ের জন্য কষ্ট পাচ্ছে ও। বেলার খুব মায়া হয়, মৃত্যু ব্যতীত ভিন্ন কিছু নিয়ে কথা বলা দরকার কিন্তু কিছুই মাথায় আসছে না।

'আজকের দিনটা বেশ অদ্ভুত তাই না রাশেদ?'

'হ্যাঁ, সকালে কুয়াশা ছিল, দুপুরে প্রচণ্ড রোদ্দুর, বিকেলে মেঘ।'

'শোন, বৃষ্টি হলে কিন্তু ভিজব, না করতে পারবে না।'

রাশেদ হাসে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেলার কি বয়স বেড়েছে? ও কি এতদিনে ওর বউ হতে পেরেছে নাকি আগের মতো বন্ধুই রয়ে গেছে? রাশেদ ধরতে পারে না। অদ্ভুত এক সরলতা বেলার চোখে, কথা বলায়, আবদারে। রাশেদ না করতে পারে না, হ্যাঁ-ও বলে না। কেবল প্রসঙ্গ বদলায়।

'মা ভালো কবিতা লিখতেন জানো?'

'হুম, জানি।'

'তুমি কি মার এপিটাফের কবিতাটা পড়েছ বেলা?'

'হ্যাঁ, রোদ দেখিয়েছিল। কবিতাটা অদ্ভুত, তাই না?'

'কী জানি! আমি কবিতা ভালো বুঝি না। কেবল যতবার ওটা পড়ি বুকের ভেতর ফাঁকা ফাঁকা লাগে।'

'মার ডায়েরিটাও আমি বহুবার পড়েছি। আচ্ছা, উনি কি কোনো কারণে সবসময় অস্বস্তিতে ভুগতেন?'

'অস্বস্তি বলতে?'

'মার অধিকাংশ কবিতাই ঈশ্বরকেন্দ্রিক ছিল। সবক'টি কবিতাই ঈশ্বর, মন, আত্মা সম্পর্কিত। যেন এমন তিনি ঈশ্বরকে একই সঙ্গে মানছেন, মানছেন না। প্রচণ্ড ভালোবাসা ঈশ্বরের প্রতি আবার অভিমান।'

রাশেদ চুপচাপ ভাবে, কিছু মনে পড়ে না। রোদ জানতে পারে, ওকে জিজ্ঞাসা করা দরকার।

'ঘুমের সমস্যা ছিল মায়ের, সারারাত জেগে থাকতেন। কিছুটা ভাবুক ধরনের ছিলেন আর ভুলো মনাও। খোঁপায় গামছা পেঁচিয়ে সারাবাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজতেন। যখন কেউ বলত তোমার চুলে, খুব লজ্জা পেতেন।'

'ইশ, তোমার সঙ্গে যদি আর দুই বছর আগে পরিচয় হতো, মার সঙ্গে আমার দেখা হতো।'

'রোদ কি কবিতা লেখে এখনো?'

'হ্যাঁ লেখে, মার চেয়েও সুন্দর। দেখাতে লজ্জা পায়।'

রাশেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাইকে নিয়ে বড় চিন্তা হয় ওর। সবই ঠিক আছে কেবল লেখাপড়া যদি করত!

'ওর লেখাপড়ার কী অবস্থা বেলা, পাস করবে?'

রোদকে নিয়ে বেলাও চিন্তায় থাকে। বারবার বোঝায়, জীবন চলার পথে লেখাপড়া ঠিক কতটা জরুরি। সবই বুঝতে পারে, সবই করতে পারে কেবল লেখাপড়াটাই ঠিকভাবে করে না।

'তুমি দেখো ও একদিন অনেক বড় কিছু করবে। প্রতিভা আলোর মতো, একদিন প্রকাশ হবেই।'

রাশেদ বেলার কথায় বিরোধিতা করে না আবার সম্মতিও দিতে পারে না। আজকাল ও প্রতিভা শব্দের কোনো মানে খুঁজে পায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়া ছাত্র দু'বছর বাড়িতে বেকার বসে আছে। চাকরির জন্য আবেদন করলে পরীক্ষা হয় না, পরীক্ষা হলে রেজাল্ট হয় না। সব মিলিয়ে অস্বস্তিকর অবস্থা। বাবা বেঁচে থাকলে নিশ্চয় এত কিছু ভাবতে হতো না। বাবার অবস্থান স্পষ্ট হয়, সম্মান বাড়তে থাকে। বাবাকে কী ও কখনো বলেছিল,

'বাবা ভালোবাসি তোমাকে। মায়ের মতো না হোক, অনেকটা।'

রাশেদ ভাবতে থাকে, মনে পড়ে না। বাবাকে না হোক, বেলাকে শেষ কবে ভালোবাসি বলেছে? তাও মনে পড়ে না। রাশেদ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ

দাঁড়িয়ে পড়ে, বেলার হাত ধরে।

'বেলা!'

'হ্যাঁ বলো।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

বেলা অবাক হয়ে রাশেদের চোখে তাকায়। আকস্মিক ভালোবাসার উত্তাপে উত্তর খুঁজে পায় না, মৃদু হাসে। ভাঁজ পড়া হাসিমুখ রাশেদের কানের কাছে এসে থেমে যায়। ফিসফিস করে বলে,

'আমিও তোমায় ভালোবাসি, খুব!'

৫

রোদ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কয়েক মিনিট আগেও প্রচণ্ড রোদ্দুর ছিল। হঠাৎ মেঘ, চারপাশ অন্ধকার। সন্ধ্যা হতে এখনো ঘণ্টাখানেক বাকি। অথচ মনে হচ্ছে রাত নেমে গেছে, বৃষ্টি হবে নিশ্চয়। ভিজতে পারলে বেশ হতো।

দূরে রাশেদ আর বেলাকে দেখা যাচ্ছে। বেলা নতুন শাড়ি এখনো পরে আছে, বেশ লাগছে। দু'জনকে পাশাপাশি কী সুন্দর মানিয়েছে! প্রথম যেদিন বেলা রাশেদের বউ হয়ে এলো, রোদের সে কী লজ্জা! লাল টুকটুকে পরীর মতো মেয়ে, তাকে ভাবী ডাকতে হবে। লজ্জা করে প্রথম প্রথম বেলার সঙ্গে কথা বলত না। সময় বদলেছে, বেলা কত নিপুণভাবেই না সবকিছু আপন করে নিয়েছে। এখন সেই রোদের কাছের বন্ধু, ভরসার শেষ অবলম্বন। সম্পর্কগুলো হয়তো এমনই, জোয়ার-ভাটার মতো নিয়ম মেনে চলে। দূরের মানুষ কাছে আসে, কাছের মানুষ আস্তে আস্তে বৃত্তের বাইরে চলে যায়। সময়ের মস্ত বড় পেট, সবকিছু গিলে খায়, অতীত ভুলিয়ে দেয়। বাবা-মা নেই, শূন্যস্থানে বেলা আছে ছায়ার মতো, মায়ের মতো।

'কিরে মাস্তান, তোর পড়া কতদূর?'

রোদ বেলাকে দেখে হাসে, হাসলে কী সুন্দরই না দেখায় ওকে। শরীরের বয়স বেড়েছে, মনের সারল্য ধরে রেখেছে।

'ভালো ভাবী, মনে হয় এ যাত্রায় বেঁচে যাব।'

বেলার মন খুশিতে ভরে ওঠে। রোদের মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে এলোমেলো করে দেয়। ওর মাথাভর্তি চুল, রাশেদেরও তাই, আওলাতে বেশ লাগে।

'গুড বয়, ভেরি গুড বয়। মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। পড়তে থাক, আলো আসবেই।'

বেলা আশপাশে তাকায়, রাশেদ নেই। রোদকে ফিসফিস করে বলে,

'ভিজবি?'

'চলো যাই।'

'মায়া ভিজবে নাকি জানিস?'

'জানি না, বলে দেখব?'

'বল। ভিজলে চুপিচুপি ওকে নিয়ে ছাদে চলে যা, আমি নতুন শাড়িটা চট করে বদলে আসছি।'

'ভাইয়া যদি বকে?'

'বকলে একসঙ্গে বকা খাব, সমস্যা আছে? বেশি বকলে ঝগড়া বাধিয়ে দেব না।'

রোদ হাসতে হাসতে জোরে মাথা নাড়ায়। ওর ভিজতে বা বকা খেতে আপত্তি নেই।

আবীর ছাদে চুপচাপ বসে আছে। একদল পিঁপড়া কিছুক্ষণ আগেও দল বেঁধে এদিক-সেদিক ঘুরছিল আর মুখে করে কিছু একটা নিয়ে যাচ্ছিল। একটি পিঁপড়া অন্য পিঁপড়ার সঙ্গে দেখা হলেই সামনে অ্যান্টেনার মতো শুঁড় নাড়িয়ে কোনো সংকেত দিচ্ছিল। ক্ষুদ্র একটা প্রাণী অথচ কী বৃহৎ তাদের পরিকল্পনা, কী দারুণ শৃঙ্খলা! মেঘ করার ঠিক আগে আগে হঠাৎ দলবেঁধে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রকৃতির সঙ্গে কী দারুণ সম্পর্ক ওদের। আর মানুষ! বুদ্ধির বড়াই দেখিয়ে সম্পর্ক আস্তে আস্তে ছিন্ন করছে। এর ফল কোনোদিন ভালো হবে না।

দূরে বাবলা গাছটায় অনেকগুলো চড়ুই পাখির বাসা। সবাই একসঙ্গে নীড়ে ফিরছে, জড়ো হচ্ছে। বৃষ্টি হবে নিশ্চয়ই। বৃষ্টি সহ্য হয় না ওর, মেঘও না। এত সুন্দর কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল এভাবে নষ্ট হওয়ার কোনো মানে হয় না। সৃষ্টির স্রষ্টা খুব বেরসিক। কয়েকদিন আগে না বর্ষা গেল! কী দরকার বাবা এই শীতের শুরুতে বর্ষা দেয়ার?

'আবীর ভাইয়া, কেমন আছো?'

আবীর মুখ তুলে তাকায়। বেলা নতুন শাড়ি বদলে কালো পাড়ের সবুজ শাড়ি পরেছে। পোশাক মানুষ বদলাতে পারে না, চেহারা খানিক বদলে দেয়। শাড়ি বদলের সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম লাগে ওকে।

'ভালো আছি ভাবী, তুমি কেমন আছো?'

'আমিও ভালো আছি, শুনলাম বটতলায় পাগলী এসেছে তুমি নাকি তার স্পন্সর?'

আবীর ফিক করে হেসে ফেলে। সচরাচর ও হাসে না, মুখ গম্ভীর করে রাখে। দাঁতের ওপর দাঁত ওঠা ওর, হাসলে অন্যরকম লাগে। অথচ সারাবছর

হাসবে না, চুপচাপ হয়ে বসে থাকবে। সবসময় কী যেন ভাবে, সময় নিয়ে ধীরে ধীরে একটু একটু করে খায়। কথা বলে এমনভাবে যেন সব তথ্য ওর জানা। উপহাস, কৌতুকের ভিড়ে কিছু লুকায়। বেলা বুঝতে পারে, ধরতে পারে না। সারাদিনে কত কত কথা বলে, তবু যেন কিছুই বলে না। এমন মুখচোরা কেন ও!

'হুম, পাগলী যা যা বলছে সব মিলছে, চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'বাহ, যাব একদিন তোমার সঙ্গে।'

'কবে যাবে?'

'তুমি একদিন আমায় নিয়ে যেও।'

'আচ্ছা।'

বেলা খুশি মনে চারপাশ দেখে। পশ্চিমে মায়াদের বাঁশবাগান, বাঁশবাগানের ফাঁকে ফাঁকে ঘন কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। একদল সাদা বক দলবেঁধে মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। কড়ই গাছের হলুদ পাতাগুলো শিশিরের মতো ঝরে পড়ছে।

'কী সুন্দর আবহাওয়া দেখেছ ভাইয়া?'

আবীর কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মেঘের অপরূপ সৌন্দর্য ওর চোখে ধরা পড়ে না, কেবল আপন মনে কিছু ভাবে।

'তোমার পাগলীর সাহায্য নিয়ে বলো তো আজকে বৃষ্টি হবে কিনা?'

'কারো সাহায্য লাগবে না, আজ বৃষ্টি হবে।'

বেলা জোরে হেসে ওঠে। আবীর বেলার হাসির কারণ ধরতে পারে না। কেবল বুঝতে পারে, কম-বেশি পাগল আসলে সবাই। তা না হলে কি কেউ গাছের সঙ্গে কথা বলে, অকারণে হাসে!

রোদ আর মায়া চুপিচুপি ছাদে আসে। মায়া সুপারি গাছটায় একবার উঁকি দেয়, কাঠবিড়ালি দুটো নেই। ওদের কথা ভেবে মায়ার মন কেমন কেমন করে। কোথায় গেল ওরা! আর ওদের ওই ছোট্ট বাচ্চা তিনটা ভালো আছে তো? জানতে পারলে বেশ হতো। ছাদের অন্যপাশে বেলা হাসছে, কী সুন্দর নিষ্পাপ হাসি। কোনোকিছুতে অভিযোগ নেই, বাড়তি চাওয়া নেই, অতিরঞ্জিত ভাব নেই। আবীরের কথায় এই গ্রহে কেবল বেলাই হাসে, কীভাবে পারে!

মায়ার কৌতূহল আকাশচুম্বী, হাসির কারণ ওকে জানতে হবে। আবীরের কাছে কাঠবিড়ালি দুটোর খোঁজ করতে হবে। দুপুরে ওকে কুত্তা বলার জন্য কথা বলতে সংকোচ হচ্ছে, তবু বলতে হবে। মায়া আর রোদ ধীরপায়ে আবীরের পাশে এসে দাঁড়ায়।

'সরে যা দাদা, বসতে দে।'

আবীর মায়ার চোখে তাকায়। ও কোমরে হাত দিয়ে মাস্তান মাস্তান ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কপালে কালো টিপ থাকায় মাস্তান ভাব কিছুটা কেটে গেছে। বড় সাইজের লাল টিপ হলে মানিয়ে যেত।

'আল্লাহর দুনিয়ায় এত জায়গা, আমার জায়গাতেই বসতে হবে?'

'সরতে বলেছি সরবি, তোকে দাদা বলে ডাকি কেন? বোনের জন্য একটু জায়গা ছাড়তে পারবি না, কেমন ভাই তুই?'

মায়া ঝড়ের বেগে কথাগুলো বলে যায়। আবীর না সরে উঠে দাঁড়ায়। পশ্চিম থেকে হু হু করে বাতাস বইতে শুরু করেছে, বৃষ্টি আসবে এক্ষুনি। শীতের বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়ে রাশেদের মতো খুকখুক করে কাশতে কাশতে মরে যাওয়ার চেয়ে ঘুম দেয়া ভালো।

'দাদা, ভিজবি আমাদের সঙ্গে?'

'আমাকে দেখে কী তোর বেকুব মনে হয়?'

মায়া মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে হাসতে বলে

'হয় তো।'

'মনে হয়েও লাভ নেই, আমি বেকুব নই। এই বৃষ্টিতে বেকুবেরা ভিজতে পারে, একজন বুদ্ধিমান আর ভদ্রলোক কেন ভিজবে?'

আবীরের কথায় বেলা আবার হাসে। মায়া কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারে না। ঝড় শুরু হয়েছে। একরাশ ধুলা বৃষ্টির বার্তা নিয়ে আসে। বিজলি চমকায়, খুব কাছে কোথাও বাজ পড়ার শব্দে মায়া ভয় পায়। ওর পাশে রোদ দাঁড়িয়ে। রোদের শক্ত দুটো হাত নিজের কান বাদ দিয়ে মায়ার কান চেপে ধরে। বাজ পড়ার বিকট শব্দ ওই শক্ত হাতে বাঁধা পড়ে। মায়া রোদের ভালোবাসার গভীরতা বুঝতে পারে। অবাক হয়ে রোদকে দেখে। রোদের চোখ নিয়ন বাতির মতো চকচক করছে, মুখে মৃদু হাসি। মায়া চেয়ে চেয়ে দেখে। খুব ইচ্ছা হয় রোদকে জড়িয়ে ধরতে, একবার ছুঁয়ে দিতে। ইচ্ছের মৃত্যু হয় আবীর আর বেলার উপস্থিতিতে।

সামনে ওদের কঠিন সময়, ঝড়ের মতোই। রোদের শক্ত হাতের ওপরে মায়ার ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে। সহস্র বছরের সংস্কার আর ধর্মের বিপরীতে ভালোবাসা। পাঁচ হাজার বছরের পুরনো যুদ্ধ। সমাজ এটা কোনোভাবেই হতে দেবে না। ভাবতে গেলে রক্ত হিম হয়ে আসে মায়ার। বৃষ্টি ছাপিয়ে বুকের ভেতরে মরুভূমির শূন্যতা অনুভব করে। কল্পনার চোখ যতদূর যায় কেবল নিস্তব্ধতা!

৬

রাশেদের মন ভালো নেই, বেলার ওপর অভিমান কমছে না। বিকেলে মেঘ দেখে একটু শুয়েছিল। মাঝে ঝড় হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে, বেলা রোদ আর মায়াকে সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে ছাদে গিয়ে ভিজেছে, কেবল ওর ঘুম ভাঙেনি। শীতের বৃষ্টি ভয়ঙ্কর, ভিজলে ঠাণ্ডা লেগে যায়। বেলার মাথা ভর্তি চুল, শুকাতে সময় লাগে। ও কথা শোনে না, বুঝতে চায় না।

রোদের ঘরের জানালা খোলা ছিল। ঝড় এসে ঘরের সব কাগজপত্র লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। ঘরময় বৃষ্টির পানি, গাছের পাতা, ডালপালা আর কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার হয়ে আছে। ইলেকট্রিসিটি নেই, আজ আসবে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। বেলা ঘরে ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে রোদের ঘর গোছায়। রাশেদ চুপচাপ উঠানে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখে, ওর অভিমান বাড়তে থাকে।

বারান্দার এক কোণে এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। বেলা হাতে তুলে নেয়। রোদের হাতের লেখা। ওর হাতের লেখা সুন্দর, দেখলেই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় যেন কাগজের কার্পেটে একরাশ কালো অক্ষরের মুক্তা ছড়িয়ে আছে। স্পর্শ করলেই ঝন ঝন করে বেজে উঠবে। বেলা লেখার ওপর আলতো করে হাত বোলায়। খাতা ভর্তি করে কবিতা লেখা।

ভালোবাসা দিয়ো দু'হাত খুলে,
বটবৃক্ষের শীতল মূলে,
তুমি নিয়ে এসো শত বৃষ্টি কণা,
আমি, শুধু আমি যদি হই আপনজনা।
ঘুমায় যদি, স্বপ্ন দিয়ো,
কোলবালিশের মানুষ ভেবে,
আমাকেও তুমি সাথে নিয়ো।
আমাকেও তুমি দিয়ো আড়ি,
ভাঙা অভিমানে স্বপ্ন ছাড়ি,

যদি অলিক হও, তবু দেখতে দিয়ো,
যাত্রা ভুলের যাত্রী করে,
আমাকেও তোমার সাথে নিয়ো।
আমাকেও তুমি দিয়ো গো ব্যথা,
যদি ভুল হয় ভুলের কথা,
ক্ষমা না কর তো শাস্তিই দিয়ো,
পাপভোগ সব শেষ হয়ে গেলে
আমাকেও কিন্তু সাথে নিয়ো।
এ মনে তুমি থাক যতদূর,
একটু একটু করে বহুদূর,
যদি ক্লান্ত তুমি, জিরিয়ে নিয়ো,
আবার রথের যাত্রা হলে,
এই, আমাকেও তুমি সাথে নিয়ো।

বেলা রোদের কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়। ভাগ্যিস বৃষ্টি হয়েছিল, না হলে লুকিয়ে রাখত, দেখাত না কাউকে। তারপর হঠাৎ প্রতিভার ছাপ হারিয়ে যেত, মায়ের কবিতার মতোই।

বেলা কবিতা ফিরিয়ে দেয় না। সযত্নে তালাবন্দি করে রেখে ধীরপায়ে রান্না ঘরে ঢোকে। রাশেদ আরো একবার উঠানে দাঁড়িয়ে চুপচাপ বেলাকে দেখে। ঘুম থেকে উঠেছে প্রায় এক ঘণ্টা হতে চলল অথচ বেলা একটাবারের জন্য ওর খোঁজ করেনি।

মনোযোগ পাওয়ার জন্য রাশেদ দু'বার খুকখুক করে কাশে, বেলা দেখেও না দেখার ভান করে। রাশেদ হতাশ হয়ে আকাশ দেখে। মস্ত বড় থালার মতো চাঁদ উঠেছে। মেঘ এসে একটু পরপর চাঁদ ঢেকে দিচ্ছে, কী বিরক্তিকর। আবার বৃষ্টি হবে নাকি!

'তোমার চা।'

রাশেদ ফিরে তাকায়, বেলা চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে। চাঁদের নরম আলো সরাসরি বেলার মুখে এসে পড়ছে। যেন মানুষ নয়, সাক্ষাৎ স্বর্গ থেকে নেমে আসা অপ্সরা।

'থ্যাংক ইউ, রোদ কোথায়?'

'ওর ঘরে পড়ছে, কী দরকার আমায় বলো।'

'কিছু না।'

'কিছু নাই যেন হয়, ওকে কিন্তু বকতে পারবে না। আমার একা ভিজতে

ভালো লাগে না, তাই ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

রাশেদ চায়ের কাপে চুমুক দেয়। চায়ে মিষ্টি একটা গন্ধ সরাসরি নাক দিয়ে ঢুকে মস্তিষ্কে ধাক্কা দেয়। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিমান ধোঁয়ার মতো উবে যাচ্ছে। রাশেদ প্রাণপণ চেষ্টা করে অভিমান ধরে রাখার, বেলাকে কিছু কথা শোনানোর।

'তুমি একদিন নিউমোনিয়াতে মরবে, নিজে তো মরবেই, সঙ্গে রোদ আর মায়াও মরবে।'

বেলা হাসে, এই হাসি অপরাধ করতে পারার আনন্দের, অপরাধ করে বেঁচে যাওয়ার আনন্দের। ওকে সুন্দর দেখায়।

'উহু! কিচ্ছু হবে না, আমাদের অভ্যাস আছে। একটু-আধটু ভিজলে কিছু হয় নাকি?'

রাশেদ কিছু বলে না। মেঘের মতোই ওর অভিমান কেটে গেছে। বেলা কাছে এসে রাশেদের কপালে হাত দেয়। রাশেদের জ্বর নেই, ওকে খুশি দেখায়।

'তুমি রাগ করেছো আমার ওপর?'

'না।'

'কষ্ট পেয়েছো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

বেলা রাশেদের হাত শক্ত করে ধরে ওর কাঁধে মাথা রেখে মৃদু হাসে।

'সরি রাশেদ, খুব!'

'কেন ছেলেমানুষি করো বেলা, এখন ঠাণ্ডা লাগলে সারবে বলো?'

'বললাম না, ঠাণ্ডা লাগবে না।'

রাশেদ হাল ছাড়ে না, শেষ একবার চেষ্টা করে।

'হুম তোমরা তো এক একজন গণক। বটতলায় নাকি বিখ্যাত পাগলী এসেছে, যা বলছে সব মিলছে। সবাই তার কাছে না গিয়ে তোমার কাছে এলেই তো হয়। পাগলী মাতা চৌধুরী কামরুন্নাহার বেলা।'

বেলা কাঁধ থেকে মাথা সরিয়ে রাশেদের চোখের দিকে তাকায়। ভ্রু কুঁচকে ঠোঁট খানিক বাঁকা করে বলে,

'তুমি কি আমায় অপমান করার চেষ্টা করছো?'

'না।'

'তো, ঝগড়া করবে আমার সঙ্গে?'

'না, ঝগড়া করব কেন?'

'খবরদার, একদম করবে না।'

'হুম।'

বেলা আবার রাশেদের কাঁধে মাথা রেখে ওর হাত ধরে চোখ বন্ধ করে। খানিক পরে অভিযোগ করে বলে,

'তুমি আমায় ভালো-টালো বাসো না, না কী?'

'বাসব না কেন?'

'প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছো, তার মানে নিশ্চয় কোনো ঝামেলা আছে।'

'বাসি, বাসি, ভালোবাসি।'

'অনেক তো?'

রাশেদ হেসে ওঠে, ওকে দেখে বেলাও হাসে। বেলা বুঝতে পারে রাশেদের অভিমান পুরোপুরি কেটে গেছে, কেটে গেছে আকাশের মেঘও। রাশেদ বেলার বাম গালে চিমটি কাটতে কাটতে বলে,

'হুম, অনেক।'

'তাহলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।'

রাশেদ বেলার কথামতো ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

'রাশেদ।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'আমি যদি কোনোদিন না থাকি, তুমি কি আমায় ভুলে যাবে?'

'ভুলব না, তোমাকে ভুলে যাওয়া মানে তো নিজেকেই ভুলে যাওয়া তাই না?'

'সত্যি তো?'

'হুম, একদম সত্যি।'

বেলা কাঁধ থেকে মাথা সরিয়ে সরাসরি রাশেদের চোখে তাকায়। চাঁদের আলোয় চোখ দুটো স্পষ্ট দেখা যায় না, কেবল বোঝা যায়।

'ভুলবে যখন না, তখন তোমাকে প্রতিদান দেই।'

রাশেদ চুপ করে থাকে। ঠোঁট উল্টিয়ে কাঁধ মৃদু ঝাঁকায়।

'বুঝিনি।'

বেলা রাশেদের মতো করেই ও রাশেদের বাম গালে চিমটি কাটতে কাটতে বলে,

'আপনি বাবা হবেন স্যার, আমি হব মা।'

৭

মায়ার বারান্দা থেকে বেলাদের উঠান দেখা যায়। অনেকক্ষণ হলো ও বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে। ইলেকট্রিসিটি নেই বলে মোমবাতি জ্বালিয়েছিল, ছোট্ট একটা হাওয়াতেই নিভে গেছে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটানা মৃদু বাতাস হচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকারা একসঙ্গে ডেকে চলেছে। দূরে একটা ডাহুক পাখি করুণ স্বরে ডাকছে।

দুপুরে আবীরকে কুত্তা বলেছিল, সামান্য কারণে এত রেগে যাওয়া ঠিক হয়নি। কেমন অস্বস্তি হচ্ছে, বুকের ভেতরে খচখচ করছে। ওর সঙ্গে কিছু ভালো কথা বলা দরকার, একবার ক্ষমাও চাওয়া উচিত। বলতে গেলে আবার নতুন কিছু নিয়ে রাগিয়ে দেবে। বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না ওর সঙ্গে, ধৈর্য লাগে। মায়ার সবই আছে কেবল ধৈর্যই নেই।

মায়া ঘড়ি দেখে, আটটা ছেচল্লিশ। দু'দিন পর পরীক্ষা, পড়া দরকার। রোদ কতদূর পড়েছে খোঁজ করতে হবে। বাইরের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে, বাতাসও কমে গেছে। চাঁদের নরম আলোয় দূরে রাশেদ আর বেলাকে দেখা যাচ্ছে। মায়া আগ্রহ নিয়ে ওদের দেখে। বেলা রাশেদের মুখে চিমটি কেটে কিছু বলছে আর হাসছে, ওর খারাপ মন মুহূর্তে ভালো হয়ে যায়।

মায়া উঠে দাঁড়ায়। রান্নাঘরে টিপটিপ করে আলো জ্বলছে। আবীর গরম গরম নুডলস খেতে পছন্দ করে। মায়া যত্ন করে ওর জন্য নুডলস বানায়।

আবীর চুপচাপ ছাদের এক কোণে বসে আছে, ওর মন ভালো নেই। সন্ধ্যায় সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টির কারণে আর নিচে নামা হয়নি। বৃষ্টি শেষে নিচে নামতেই হতাশ হয়। ইলেকট্রিসিটি নেই তার ওপর শুক্রবার, সব দোকান বন্ধ হয় গেছে। ভাত ছাড়া ওর দুই রাত দিব্বি চলে, সিগারেট ছাড়া চলতে চায় না। অনেকবার ভেবেছিল সিগারেট ছেড়ে দেবে কিন্তু সম্ভব হয়নি। এখন কী হবে!

'সরে যা দাদা, বসব।'

মায়া নুডলস ভর্তি বাটি হাতে দাঁড়িয়ে, ওর চুল খোলা। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুলগুলো সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে আছে। চার্জার লাইটের সাদা আলোয় চোখ দুটো চিকচিক করছে। চেহারার মাস্তান ভাব কেটে গেছে, ফুরিয়ে যায়নি। আবীর পাশে সরে বসতে বসতে মায়াকে নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়।

'মায়া।'

'হুম, বল।'

'একটা কাজ করতে পারবি?'

'কী কাজ?'

'পারবি কিনা সেটা বল।'

'না।'

আবীর বিরক্ত হয়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে। এই শব্দ হতাশার, বিরক্তির।

'তোকে সত্যি সত্যি আর পরের দীপাবলিতে আমার হাতে রাখি বাঁধতে হবে না, তুই আমার বোন না।'

মায়া হাসে। আবীরকে বিরক্ত করতে পারার আনন্দে ওকে খুশি দেখায়।

'আচ্ছা, কী করতে হবে বলবি তো।'

'পারবিই যখন না বলে কী লাভ?'

'লাভ-লোকসান পরে, আমি তো তোর সঙ্গে ব্যবসায় নামিনি যে লাভ-লোকসানের হিসাব করতে হবে। আগে বল শুনি, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

'আমার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। বৃষ্টি হয়েছে তো তাই সব দোকান বন্ধ। কাকার সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট এনে দিতে পারবি?'

'না।'

আবীর হতাশ হয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে কাঁধ ঝাঁকায়। আজকের দিনটা বিকেল থেকেই কুফা, ও মনে মনে ভাবে।

'তোকে একটা বুদ্ধি দিতে পারি দাদা।'

'কী?'

'বটতলার পাগলীর কাছে সাহায্য চাইতে পারিস। যে পাগলী দু'দিনে হারিয়ে যাওয়া মানুষ খুঁজে দিতে পারে সে দুটো সিগারেটের ব্যবস্থা দুই সেকেন্ডে ঠিক করতে পারবে।'

মায়া কোনোরকম কথা শেষ করে জোরে জোরে হাসে। সচরাচর আবীরকে রাগিয়ে দেয়ার মতো সুযোগ হয় না, আজ হয়েছে। মায়ার আনন্দ ধরে না। বেঁচে থাকা একদম খারাপ না, আনন্দ আছে, মায়া ভাবে।

'তুই কী আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছিস?'

মায়া হাসতে হাসতে বলে,

'হ্যাঁ করছি।'

'আচ্ছা ভালো, কর ইয়ার্কি। হাতি খাদে পড়লে চামচিকাও লাথি দেয়, তুই কেন দিবি না।'

মায়া আবার হাসে। ওর হাসির প্রতিধ্বনি ছাদময় নিক্বণের মতো বাজতে থাকে।

'নুডলস খাবি?'

'খাব, তবে নুডলসের চেয়ে আপাতত সিগারেট বেশি জরুরি।'

'আচ্ছা আগে নুডলস খা, তারপর দেখছি কী করা যায়।'

আবীরের মন খুশিতে ভরে ওঠে। মায়ার প্রতিশ্রুতি খুব তীব্র, কিছু করতে চেয়েছে মানে করবে। আপাতত নিশ্চিন্তে থাকা চলে। আবীর কচ্ছপ গতিতে একটু একটু করে নুডলস মুখে দিয়ে যত্ন করে খায়। দেখতে খুব মায়া লাগে। সেই কোন ছোটবেলায় মা একদিন ডেকে বলল,

'ওর নাম আবীর, আজ থেকে ও এখানেই থাকবে। তুমি ওর বোন, ও তোমার ভাই।'

রোদের বাবা-মা মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ও মায়াদের সঙ্গেই থেকেছে। মায়ার মা ওকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন, লাভ হয়নি। পড়া ছেড়ে ব্যবসায় নেমেছে। ও কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, সে অতীত কেউ জানে না। বহুবার ওরা জানার চেষ্টা করেছে, আবীর কিছুই বলেনি বরং কৌশলে পাশ কাটিয়ে যায়। খুব অদ্ভুত এক ছেলে, কত কথা বলে তবু যেন কিছুই বলে না। মায়া আরো একবার চেষ্টা করে, দরদ মিশিয়ে বলে–

'দাদা, তুই এত ধীরে ধীরে খাস কেন?'

আবীর মায়ার চোখে একবার তাকায়, তারপর আবার খাওয়ায় মনোযোগ দেয়। এক টুকরা নুডলস পানি দিয়ে গিলে শেষ করে বলে,

'জলদি কা কাম শয়তানকি, আমাকে দেখে তোর শয়তান মনে হয়?'

'না, মনে হয় না।'

আবীর আবার খেতে শুরু করে। মায়া খাবার শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

'দাদা।'

'কী বলবি বল।'

'তোর দেশ কোথায়?'

'বাংলাদেশ।'

'এই দেশ মানে সেই দেশ না। তুই এসেছিস কোথা থেকে, তোর বাবা-মা নেই?'

'আমি কি প্রথম মানব আদম যে বাবা-মা থাকবে না? আকাশ থেকে নিশ্চয় পড়িনি, নাকি মেরির সন্তান যে বাবা নেই?'

'তা বলিনি।'

'তাহলে?'

'তোর ধর্ম কী?'

'তোর ধর্মই আমার ধর্ম।'

'উহ! গরুর মাংস খাস আবার বলিস তোর ধর্মই আমার ধর্ম।'

'আচ্ছা আমায় একটা কথা বল।'

'কী?'

'রাস্তায় যদি একটা মানুষ অ্যাকসিডেন্ট করে পড়ে থাকে, তাহলে তাকে গিয়ে কী বলবি যে ভাই, 'আপনার ধর্ম কী, আমার সঙ্গে মিললে সাহায্য করব না মিললে করব না।'

'তা কেন বলব? মানবতা বলে একটা ব্যাপার আছে না?'

'হ্যাঁ সেটাই, চোখের জায়গায় চোখ আছে, নাকের জায়গায় নাক। পাখির কি ধর্ম আছে কিংবা গাছের? মানুষ কেবল মানুষ হলেই তো হয়, তার এত ধর্ম লাগবে কেন?'

'ধুর! তোর নাম আবীর না হয়ে প্যাঁচা হওয়া উচিত ছিল। কথা প্যাঁচানো তোর স্বভাব।'

মায়া বিরক্ত হয়, সামান্য হতাশও। আবীর কথা ঘুরিয়ে হাসতে থাকে, প্রসঙ্গ বদলে বলে,

'তোদের প্রেম কেমন চলে?'

'প্রেম চলে মানে কী?'

'দীপাবলিতে আমাকে রাখি পরাস, রাশেদকে পরাস, রোদকে কেন পরাস না?'

'রাখি না পরালেই প্রেম হয় নাকি?'

'আচ্ছা, বুঝেছি।'

দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ থাকে। মায়া আকাশ দেখে। মেঘ পুরোপুরি কেটে গেছে। পুবে প্রকাণ্ড এক রেইনট্রি গাছ। তার ডালের ভেতর দিয়ে মস্ত বড় ঝলসানো রুটির মতো চাঁদ দেখা যাচ্ছে। একদম সুকান্তের কবিতার মতো।

'দাদা, আমার ওপর রাগ করে আছিস?'

আবীর মায়ার চোখে চুপ করে চেয়ে থাকে, কথা বলে না। এর অর্থ 'তুই যা ভেবে নিবি তাই।'

'দুপুরে তোকে কুত্তা বলা ঠিক হয়নি। আমার খুব ভুল হয়েছে, মাফ করে দে।'

আবীর হাসতে হাসতে মায়ার বাম কানটা আস্তে করে ধরে, নাড়া দেয়। মাথার চুলগুলো আউলা-ঝাউলা করে দেয়।

'কোনো ব্যাপার না রে পাগলী। দাদাকে ভালোও তো তুই-ই বাসিস, তাই না? আমি কিচ্ছু মনে করিনি।'

মায়ার চোখ দুটো ভিজে ওঠে, এই ভিজে ওঠা আনন্দের। ওর মনে হয় ভাইয়ের ভালোবাসা পেতে কেবল আন্তরিকতাই যথেষ্ট, একই মায়ের পেটে জন্ম নেয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্ম জানার দরকার নেই। মায়া ওকে জড়িয়ে ধরে।

'দাদা, তুই আর আমাকে রাগিয়ে দিবি না, ঠিক আছে?'

আবীর প্রতিশ্রুতি দেয় না। ও জানে এই প্রতিশ্রুতি ও রাখতে পারবে না, কেবল হাসে। চাঁদের আলোয় সে হাসি যেন রূপকথার রূপ নেয়।

৮

বেলা আর রাশেদের বাচ্চা হবে শোনার পর থেকেই রোদের অন্যরকম ভালোলাগা কাজ করছে। ঘরময় ছোট্ট ছোট্ট হাত পা নিয়ে একটি শিশু হাঁটবে, দৌড়াবে, খিলখিল করে হাসবে ভাবতেও মনের গভীরে কোথায় যেন অন্যরকম আনন্দ হয়, পবিত্রতা খেলা করে। গভীর আবেগ নিয়ে রোদ চোখ বন্ধ করে। কল্পনার স্রোত বয়ে চলে। বছর দুই বয়সের ছোট্ট একটি বাচ্চা মেয়ে লাল ফ্রক পরে ঘরময় এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে। ঘরের কোণে কোণে লুকাচ্ছে আর লুকোচুরি খেলছে।

'তাচ্চু, তাচ্চু, তুকি, তুউউকি!'

তাচ্চু মানে চাচ্চু, তুকি মানে টুকি। রোদ ওকে দেখেও না দেখার ভান করে আশপাশ দিয়ে তাকায়। ওকে খোঁজে, পায় না।

'কই দেখছি না তো আমার মাকে, কই আমার মা-টা, কই পালাল রে। কোন রাজপুত্তুর আমার মাকে নিয়ে পালাল? এখন আমাদের কী হবে রে?'

রোদ মন খারাপ করে খানিকক্ষণ খোঁজে, না পাওয়ার ভান করে। তারপর হঠাৎই অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেয়ে গেছি ভাব করে অবাক হয়ে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

'আরে, এই তো আমার মা সোনা, এই তো আমার মা সোনা।'

রোদ ওকে কোলে তুলে নিয়ে কপালে, গালে চুমু খায়। বাচ্চাটা খিলখিল করে হাসতে থাকে। সে হাসি ঘরময় প্রতিধ্বনি হয়ে নিক্বণ সুরে বাজতে থাকে।

'কীরে পাজি না পড়ে এই অবেলা করে ঘুমাচ্ছিস কেন?'

রোদ তড়িঘড়ি করে লাফ দিয়ে ওঠে। বেলা সব বুঝে গেছে মনে করে লজ্জা পায়।

'না, মানে..., আসলে এমনি ভাবী, ঘুমাচ্ছি না।'

'তোতলাচ্ছিস কেন? মনে হচ্ছে গড়বড়, কী লুকাচ্ছিস বল তো?'

রোদ হাসতে হাসতে মাথা নাড়ায়। মেয়েদের মতো লজ্জা ওর, বেলা বুঝতে পারলেও লজ্জার কারণ ধরতে পারে না।

'ভাবী, বাবুর নাম ঠিক করেছো?'

লজ্জা প্রতিস্থাপিত হয়। বেলা লাজুক হেসে রোদের পাশে বসে ওর মাথা ভর্তি চুলে আঙুলের চিরুনি বুলিয়ে দেয়।

'না রে, নাম ঠিক করিনি।'

'করবে না?'

'বাবুর চাচ্চু কবি মানুষ, সে থাকতে আমি নাম রাখলে চলে?'

'দেখো ভাবী দারুণ ফুটফুটে মেয়ে হবে তোমাদের।'

'মেয়ে হবে কী করে বুঝলি?'

'যতবার কল্পনা করার চেষ্টা করছি, চোখের সামনে ফুটফুটে লাল ফ্রক পরা মেয়ের ছবি ভেসে উঠছে।'

'আর আমি যতবার ভাবছি ততবারই ছেলে।'

'না না, ছেলে কীভাবে হয়! কল্পনায় তো মেয়েই আসে, কিছুতেই ছেলে আসে না। তুমি দেখো মেয়েই হবে। আমার কল্পনাগুলো সবসময় সত্যি হয়।'

'আচ্ছা আচ্ছা, মেয়েই সই। কেবল দোয়া কর যা-ই হোক যেন সুস্থ হয়।'

'দোয়া করি আমার আয়ু কেটে হলেও ও যেন সুস্থ থাকে, দুধেভাতে থাকে। বহু বছর বেঁচে থাকে, মানুষের মতো মানুষ হয়। ও যেন ওর কল্পনার চেয়েও বড় হয়।'

বেলা রোদের ভালোবাসার গভীরতাও ধরতে পারে। ভালোবাসার সমুদ্রে বড় হবে ওর সন্তান, ভাবতেও চোখে পানি চলে আসে।

'ভাবী।'

'হু বল।'

'মেয়ে হলে নাম রাখব সাঁঝ।'

'সাঁঝ। বাহ খুব সুন্দর নাম তো।'

'থ্যাংক ইউ ভাবী, নাম পছন্দ হয়েছে?'

'খুব পছন্দ হয়েছে, আর যদি ছেলে হয়?'

'নাহ ছেলে হবে না।'

'আহা, যদি হয়েই যায়?'

'হলে তুমি আর ভাইয়া রেখো, আমি রাখব না।'

বেলা উঠে ধীরপায়ে ঘরের অন্য কোণের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। রোদের জানালা দিয়ে শীতে দক্ষিণে হেলে পড়া সূর্য দেখা যায়, আজ যাচ্ছে

না। সাদা একখণ্ড মেঘ সূর্যকে ঢেকে রেখেছে।

'রোদ।'

'হ্যাঁ ভাবী।'

'ছেলে হলে নাম রাখব মেঘ, নামটা সুন্দর না?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।'

'সত্যি তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম সত্যি।'

বেলা হাসে, দেখা যায় না এমনভাবে নিজের তলপেটে হাত রেখে আস্তে করে হাত বোলায়। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বলে।

'মেঘ বাবাটা, মা তোকে ভালোবাসে, খুব ভালোবাসে।'

৯

শেষ বিকেল। বেলা উঠানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দক্ষিণে হেলে পড়া শীতের সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাশেদ, রোদ, আবীর কেউ বাড়িতে নেই। আবীর সেই সকালে বেরিয়েছে, দুপুরে খেতেও আসেনি। খুব খালি খালি লাগছে ওর, কিছুই ভালো লাগছে না।

বাবাকে খুব মনে পড়ছে আজ। বারবার পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো ফিরে ফিরে আসছে।

মা মরেছিলেন বেলা ছোট থাকতেই। একমাত্র বড়ভাই সেও কানাডাতে। মাস শেষে একটি চিঠি ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক ছিল না বলা যায়। ভালোবাসা বলতে বাবা চৌধুরী ইরাজুদ্দিনই ছিলেন সব। বিকেল হলেই দু'জনে বারান্দায় চৌকিতে পাশাপাশি বসে চা খেত রোজ রোজ। কত শত বিষয় নিয়ে কথা হতো বাবার সঙ্গে। মন খুলে কথা বলতেন বাবা। শেষবার কথা হয়েছিল বিয়ে নিয়ে, রাশেদকে নিয়ে। সেই শেষ, তিনি আর কখনো নিজে থেকে বেলার সঙ্গে ডেকে কথা বলেননি।

বেলার জন্য পাত্রপক্ষ ভিড় করছিল। ও বুঝে গিয়েছিল, আর চুপ থাকা চলে না, কিছু করতে হবে। সেদিনও কথা শুরু করেছিলেন বাবা নিজে থেকেই।

'একটা ভালো প্রস্তাব এসেছে বেলা।'

'ভালো প্রস্তাব না হলে নিশ্চয়ই আমার কান পর্যন্ত আসত না গেট থেকেই বিদায় নিত।'

বাবা হাসেন, মেয়ের বুদ্ধিমত্তায় তিনি আনন্দিত। এমন বুদ্ধিমতী আর বাবা পাগল মেয়ে ক'জনের হয়! গর্বে আর আনন্দে বুক ফুলে ওঠে।

'ছেলে বিসিএস ক্যাডার, এএসপি। পরিবার খুব ভালো, এক কথায় তোর জন্য খুব ভালো।'

'আচ্ছা।'

বেলা চায়ে চুমুক দেয়। বাবা আপন মনে বিসিএস ক্যাডার পাত্রের সুনাম

গাইতে থাকেন। বেলা চা শেষ করতে করতে নিজেকে গুছিয়ে নেয়। সময় এসে গেছে, আর চুপ থাকা চলে না। এবার কিছু একটা করতে হবে।

'বাবা!'

'বল মা।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি বাবা।'

'আমিও তোকে খুব ভালোবাসি রে মা।'

'কপালে চুমু তো দিলে না। মনে হয় ভালোবাসা কমে গেছে!'

বাবা হাসেন, মেয়ের কপালে শব্দ করে চুমু দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। কোটি বছরের পুরনো অথচ অকৃত্রিম পিতৃ ভালোবাসা।

'বাবা!'

'হ্যাঁ মা, বল।'

'বাবা, আমি আরো একজনকে ভালোবাসি, তাকে বিয়ে করতে চাই।'

ইরাজুদ্দিনের কপালে ভাঁজ পড়ে। মুহূর্তের ব্যবধানে পরিচিত রক্তকে অপরিচিত মনে হয়। কী আজব, সেদিনের ছোট্ট মেয়ে হাঁটতে গিয়ে বারবার পড়ে পড়ে যাচ্ছিল, সে নিজে থেকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। তিনি মুখে একটা কৃত্রিম হাসি আনার চেষ্টা করেন, পারেন না। মেয়ের কথায় বড়সড় ধাক্কা খেয়েছেন, কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। নিজের রক্ত চেনেন তিনি। শীতল, নীরব, হাসিখুশি অথচ ইস্পাত কঠিন সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা কিছুতেই বদলাবে না। কবে কবে এত বড় সিদ্ধান্ত নিল ও, একবার জানালো পর্যন্ত না!

'কে সে?'

'বাবা, রাশেদ।'

তিনি রাশেদকে চিনতেন, বেশ কয়েকবার কথাও হয়েছিল। ছেলে হিসেবে ভালোরা সবসময় পাত্র হিসেবে ভালো হয় না। রাশেদ তার চোখে তেমন একজন।

'বেলা, আমি যার কথা বলছি সে রাশেদের চেয়ে পাত্র হিসেবে অনেক বেশি যোগ্য।'

'রাশেদ খুব ভালো ছেলে বাবা। তাছাড়া ও লেখাপড়ায়ও ফার্স্ট, ওকে সময় দিলে অনেক বড় কিছু করবে।'

'হয়তো করবে, না-ও করতে পারে অনিশ্চয়তা আছে। আমার মনে হয় আহামরি কিছু হয়তো করবে না। কারণ ওর কোনো ব্যাকআপ নেই।'

বেলা ঠোঁট উল্টিয়ে মাথা নাড়ায়।

'বুঝিনি।'

'রাশেদ লেখাপড়ায় হয়তো ফার্স্ট, ফার্স্ট বয়! ও হয়তো ধরে নিয়ে বসে আছে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার হবে। শেষমেশ কিছু না হওয়ার সম্ভাবনা অনেক, কারণটা আবার বলছি, ওর পেছনে সাপোর্ট দেয়ার মতো কেউ নেই। এই দেশে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার গড়তে মাথার ওপরে একজন লাগে। যতদূর জানি ওকে টিচার বানানোর মতো কেউ নেই। অন্য দেশ হলে আলাদা ব্যাপার ছিল, কিন্তু আমাদের দেশে যেটা সচরাচর ঘটে বা ঘটছে সেটাও বুঝতে হবে। চোখের সামনে ফোর্থ, ফিফথ বয়রা টিচার হবে, সেসব দেখে দেখে সে হতাশ হবে, এছাড়া কিছু হবে না।'

'বিশ্বাস করো বাবা, এমন হবে না। ও কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির জন্য বসে সময় নষ্ট কেন করবে?'

'তোমার কথা সত্য হলে আমার কথা মিথ্যা হয়।'

বেলা চুপ করে থাকে কিছু বলে না। ইরাজুদ্দিন চোখ বন্ধ করে দেয়ালে নিজের দেহের সব ভর ছেড়ে দেন। কণ্ঠকে খাদের কাছে নিয়ে ধীরে ধীরে বলেন।

'বাবা-মা নেই মানে অগোছালো একটি জীবন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিকভাবেও অসচ্ছল। তুমি আহ্লাদে মানুষ হয়েছো, গাড়িতে চড়েছো, সেখানে তুমি সুখী হবে না বেলা। তোমার নিজের ভবিষ্যতও তৈরি হবে না। আমি হয়তো অপেক্ষা করতে পারতাম, কিন্তু তোমার মা বেঁচে নেই, আমি মারা গেলে তুমি মহাসমুদ্রে পড়বে। আমি বাবা হয়ে এত বড় ঝুঁকি নিতে পারি না। আমার কথা শোনো, এএসপি ছেলেকে বিয়ে করো, সারাজীবন সুখে থাকবে।'

বেলা বুকে জমে থাকা নিঃশ্বাস বের করে পা নাচাতে থাকে। বাবার হাত ধরে কাঁধে মাথা রেখে বিড়বিড় করে বলে,

'বাবা আমি রাশেদকে বিয়ে করব, আমি ওখানে সুখে থাকব।'

ইরাজুদ্দিন জীবনে প্রথমবারের মতো বেলার মাথার নিচ থেকে আস্তে করে কাঁধ সরিয়ে নেন। বেলার চোখে চোখ রেখে বলেন,

'আমি কোনোদিন কোনো ব্যাপারে তোমায় না বলিনি। আমার সাধ্যের মধ্যে যা যা চেয়েছো দিয়েছি। আমি বাধা দেব না, তুমি বড় হয়েছ, নিজের যত্ন নিজে নিতে জানো। তবে একটা কথা, আমার সম্মতি নেই, বাকিটা তোমার হাতে, তুমি ভেবে দেখ।'

সেদিন সারারাত বেলা কেঁদেছিল। এরপর প্রায় তিন বছর পার হয়েছে, তিনবার বৈশাখ এসেছে, ছয়বার ঈদ। যে বাবা একবেলা মেয়েকে না দেখলে

অস্থির হয়ে যেতেন, তিনি একবারের জন্য মেয়েকে দেখতে আসেননি, রাশেদকে কোনোদিন দাওয়াত পর্যন্ত করেননি। রাশেদের অসম্মান হবে ভেবে বেলাও ওপথে পা বাড়ায়নি।

বাবা ঠিক ছিলেন, রাশেদ এখনো বেকার, বেলা নিজেও কিছু করছে না। প্রথমকে বাদ দিয়ে দশমকে শিক্ষক হিসেবে রাখা হয়েছে। বাবা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছেন, বেলাও মিথ্যা বলেনি। ওরা সুখে আছে। রাশেদ হাল ছাড়েনি, হাল ছাড়েনি ও নিজেও। দু'জনই চেষ্টা করছে ভালো কিছু করার। হয়তো আর কিছুদিন সময় লাগবে, তবে ভালো কিছু হবেই। সম্মানের একমাত্র নীরব যুদ্ধে বেলা হারতে চায় না। বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলতে চায়, 'বাবা, তুমি ভুল ছিলে, তুমি ভুল ছিলে।'

বাবা কেমন আছে খুব জানতে ইচ্ছা হয় বেলার। বারবার বলতে ইচ্ছা হয়, আমি ভালো আছি বাবা, রাশেদ আমাকে খুব ভালোবাসে, একদম তোমার মতো করেই। রোদ, আবীর নিজের বোনের মতো আমায় মাথায় তুলে রাখে। সবসময় আমাকে খুশি দেখার জন্য পাগলামি করে। এত ভালোবাসা আমি কোথাও পেতাম না।

বেলার প্রচণ্ড অভিমান, বাবারও তাই। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো, এখন সয়ে গেছে। ও মা হতে যাচ্ছে, এটা জানলে বাবার মনের অবস্থা কেমন হতো, খুব জানতে ইচ্ছা হয়। বাবা কি রাগ করে থাকতে পারবেন? একবারের জন্য হলেও কি মনে হতো– দুই ঘণ্টারই তো পথ, যাই, মেয়েকে দেখে আসি।

বেলা ধীরপায়ে ঘরে ঢুকে কাগজ-কলম নিয়ে বসে, ওর হাত কাঁপতে থাকে। কীভাবে কী দিয়ে শুরু করবে বুঝতে পারে না।

প্রিয় বাবা,

আমি আরো একটা বাবা পেতে চলেছি, তুমি কি তা জানো?

বেলা আরো কিছু লিখতে চায়, কিন্তু পারে না। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। খানিক বাদে বেলা আঁচলের পাশ দিয়ে চোখ মোছে। জমে থাকা নিঃশ্বাস বের করে কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিড়বিড় করে বলে,

'আমি তোমায় ভালোবাসি না বাবা, একদম ভালোবাসি না।'

ভালোবাসা হেরে যায়, অভিমানের জয় হয় আরো একবার।

১০

চোখ মুছে বেলা বাইরে বের হয়। কান্নায় শোক কমেছে, ফুরিয়ে যায়নি। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে ও আকাশ দেখে। শীতের কালচে নীল আকাশ। একঝাঁক বাদুড় চিকচিক শব্দ করছে, আকাশে উড়ছে। দূরের তাল গাছে ওদের বাস। পা দুটো ওপরে মাথা নিচে দিয়ে সারাদিন ঝুলে থাকে। সন্ধ্যার আগে আগে একসঙ্গে দল বেঁধে নেমে পড়ে।

বেলা বারান্দা থেকে নেমে করমচা গাছটার দিকে এগিয়ে যায়। দুটো ফল ছিঁড়ে আঁচল দিয়ে মুছে মুখে দেয়। প্রচণ্ড টকে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

'ভাবী, খেতে দাও, খুব ক্ষুধা লেগেছে।'

বেলা পেছন ফিরে তাকায়। আবীর আর রাশেদ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে। রাশেদের মুখ হাসি হাসি, ও বেলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মুহূর্তের ব্যবধানে হাসি মুখ বদলে গিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ে। ও কি কিছু বুঝতে পারছে? বেলার অস্বস্তি হয়। আবীর হাতে সবুজ ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে। ক্ষুধায় আর ক্লান্তিতে মুখটা শুকিয়ে আছে ওর। দেখলে ভীষণ মায়া হয়।

'সারাদিন কোথায় ছিলে বল তো ভাইয়া? দুপুরে খেতেও আসোনি।'

'আর বোলো না ভীষণ ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।'

রাশেদ আবীরকে পাশ কাটিয়ে বেলার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রাখে।

'আবীরের পাগলী হিট, বুঝলে বেলা? আজ আমি তো দেখে অবাক হয়ে গেছি। দেখি বটতলায় মোটামুটি ভিড় জমে গেছে, সবার হাতে মিনারেল ওয়াটার আর পাউরুটি।'

'কেবল তোরা পাগলীর প্রতিভার দাম দিলি না। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, যারা প্রতিভা চেনার ঠিক চিনে নিয়েছে।'

বেলা হাসতে হাসতে অভিযোগ করে।

'তোমরা কেউ আমায় একদিন নিয়ে গেলে না, এটা ঠিক না।'

আবীর রাশেদকে বলে, 'তুই একদিন নিয়ে গেলেই তো পারিস।'

রাশেদ আবীরের কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে হাসতে হাসতে বলে,

'তোর কি আমাকে দেখে বেকুব মনে হয়?'

'হয়তো, এ আবার নতুন কী!'

আবীরের কথায় তিনজন একসঙ্গে হেসে ওঠে। আবীর সবুজ প্যাকেটটি বেলার হাতে দিয়ে বলে,

'এটা রাখো ভাবী।'

'কী এটা?'

'আমার এক ভদ্রলোক কাস্টমার আমায় খুব ভালোবাসেন। ভদ্রলোকেরা তো ভদ্রলোকেদের ভালোবাসবেই, তাই না? তো উনার আমের বাগান আছে, কয়েকটা গাছে নাকি বারো মাস ফল ধরে। আমাকে এসে জোর করে দিয়ে গেলেন। জন্মের টক বুঝলে? এ আমার দ্বারা খাওয়া সম্ভব না।'

বেলা শব্দ করে হেসে ওঠে, হাসি থামতে চায় না। আবীর, রাশেদ কেউ বেলার হাসির কারণ ধরতে পারে না শুধু অবাক হয়।

'হাসির কী হলো, বুঝলাম না।'

'ভাইয়া তুমি এত মিথ্যা বলো কেন?'

'মিথ্যা কোথায় বললাম?'

'মিথ্যা না তো কী? প্যাকেটের গায়ে লেখা মা ফল ভাণ্ডার। রাশেদ গত সপ্তাহে ওই দোকান থেকে ফল এনেছে আর কিনে এনে বলছে উপহার পেয়েছে।'

আবীর চুপ করে থাকে। রাশেদ বেলার উপস্থিত বুদ্ধিতে আরো একবার মুগ্ধ হয়। এমন হাসিতে অন্যরা লজ্জা পেত, আবীর গায়েও মাখে না। তাচ্ছিল্য মিশিয়ে বলে,

'থাক থাক হয়েছে, আর হাসতে হবে না।'

'আচ্ছা হাসব... না।'

কথা শেষ হয় না, হাসব না বলে বেলা আবার হাসে। আবীর বলে চলে,

'আমি পীর, ফকির, দরবেশ, পুরোহিত কোনোটাই নই তো, না?'

'না, তা নও।'

'তাহলে? আমার যখন ইচ্ছা আমি মিথ্যা বলব, যখন ইচ্ছা সত্য বলব, সমস্যা তো দেখি না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, বলো। আপাতত হাত-মুখ ধুয়ে এসো, আমি খাবার

দিচ্ছি।'

'দাও, দাও, ক্ষুধায় মরে গেলাম।'

'তুমি কিছু খাবে রাশেদ?'

'না, খাব না।'

রাশেদ বেলাকে পাশ কাটিয়ে কাশতে কাশতে নিজেদের ঘরে যায়। আবীর হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে। বেলা রান্নাঘরে গিয়ে সবুজ প্যাকেট খুলে দেখে অনেকগুলো কাঁচা আম। বমি ভাব থাকায় গর্ভবতী অবস্থায় মেয়েরা টক ফল খায়, নিশ্চয়ই কোথাও শুনেছে না হয় পড়েছে। সারা দুপুর নিজে না খেয়ে খুঁজে খুঁজে ফলগুলো এনেছে। বেলা অন্য মায়ের পেটে জন্ম নেয়া এই পাগল ভাইটার ভালোবাসা ধরতে পারে। এই ভালোবাসা অকৃত্রিম, নিঃস্বার্থ, ওর চোখ ভিজে আসতে চায়। আহা! মিথ্যা না হয় বলেছে, ওভাবে না হাসলেই হতো।

আবীরকে খেতে দিয়ে বেলা ঘরে ঢোকে। রাশেদ ওর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে।

'কী দেখ?'

রাশেদ কিছু না বলে বেলার কাছে এসে ওর দুই কাঁধে হাত রাখে।

'কেমন আছো বেলা?'

বেলা মুচকি হেসে রাশেদের হাতে চাপ দেয়।

'ভালো, তুমি?'

রাশেদ এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়িয়ে বেলার দিকে আরো ঝুঁকে আসে।

'তুমি কাঁদলে আমি ভালো থাকি?'

বেলা কিছু বলে না কেবল চোখ নামিয়ে নেয়।

'কেঁদেছো কেন সত্যি করে বল তো।'

'কই কাঁদিনি তো।'

'আমার বুদ্ধিমত্তা হয়তো তোমার মতো অতো ধারালো না, ভালোবাসা কিন্তু অনেক ধারালো। আমি আমার বেলাকে তো চিনি, তাই না?'

'না রে বাবা কাঁদিনি। একটু শুয়েছিলাম তাই এমন মনে হচ্ছে।'

'আমার চোখে তাকিয়ে বলো বিশ্বাস করছি।'

বেলা তাকায় না, চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। রাশেদকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

'এই বেলা, কাঁদছো কেন, কী হয়েছে?'

'বাবাকে খুব মনে পড়ছিল।'

রাশেদ চুপচাপ বেলাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, উত্তর খুঁজে

পায় না। বেলা কেঁপে কেঁপে ওঠে। কাঁদলে ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, খুব মায়া হয় ওকে দেখে।

'বেলা, চলো বাবার সঙ্গে কাল দেখা করে আসি।'

বেলা মাথা নাড়ায়। রাশেদ বলে চলে,

'দেখ বেলা, বাবা তো বাবাই, তাই না? বাবাদের মেয়ের প্রতি অভিমান সবসময় একটু বেশি থাকে। তাছাড়া বাবা তোমায় একটু বেশিই ভালোবাসতেন।'

'না রাশেদ, না। আমি চাই না তুমি বাবার কাছে ছোট হও।'

'দেখা করতে গেলে ছোট কেন হব? আর ছোট হলে হব, চল কাল যাই।'

'আমি তোমার সব কথা শুনি, আমার কথাও তো তোমায় শুনতে হবে, তাই না? আমি একবার যখন বলেছি না, তখন তোমার উচিত সেটা মেনে নেয়া।'

রাশেদ হাল ছেড়ে দেয়, কিছু বলে না। বেলা চোখ মুছে হেসে রাশেদের চোখে তাকায়।

'যাব, তোমার চাকরি হোক, তারপর মিষ্টি নিয়ে যাব, ঠিক আছে?'

রাশেদ বেলার কপালে চুমু দেয়। বেলার ভালোবাসার তীব্রতা বুঝতে পারে। ও নিজে রাশেদকে বকবে, ঝগড়া করবে, রাগ করবে, নানান ব্যাপারে দোষারোপ করবে কিন্তু কেউ ওকে নিয়ে কিছু বললে, অসম্মান করলে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। কারো কাছে একটুও ছোট হতে দেবে না।

'ঠিক আছে।'

'রাশেদ, কেউ মানুক না মানুক তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত।'

রাশেদ আরো একবার বেলার কপালে চুমু দিয়ে ওর চোখের পানি মুছে দেয়।

'বেলা তুমিও আমার জীবনের সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত।'

'সত্যি বলছো?'

'হুম, সত্যি বলছি।'

'নাকি আমি কাঁদছি বলে খুশি করার জন্য বললে?'

'না না একদম সত্যি।'

বেলা হাসে, কান্না আর হাসি একসঙ্গে মিশে যায়। ওকে রহস্যময় মনে হয়। রাশেদ কিছু বলতে চায়, বলতে পারে না। বেলার দুটো ঠোঁট ওর ঠোঁটে মিশে গেছে। জীবন আটকে গেছে ভালোবাসার আলিঙ্গনে।

১১

শীতের সকাল। কোনো কোনো সকালে প্রচুর কুয়াশা হয়। কুয়াশা বৃষ্টির মতো ঝিরঝির করে পড়তে থাকে, আজকের সকাল ঠিক তেমন।

বোদ আর মায়া পাশাপাশি হাঁটছে। ওদের সামনে অনেকটা দূরে বেলা, রাশেদ আর আবীর কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছে আর হাসছে। মায়ার নিজের ওপরে রাগ হয়, সবাই কত কত মজা করে কথা বলে কেবল ও-ই পারে না, অল্পতে রেগে গিয়ে চিৎকার করে।

রোদের প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। শীতের সকালে ঘুম থেকে ডেকে তোলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মায়া ইচ্ছা করে ওকে ডেকে তুলেছে, জোর করে হাঁটতে নিয়ে বেরিয়েছি। এখন থেকে সকালে প্রতিদিন নাকি হাঁটতে হবে, এসবের কোনো মানে হয়!

'মায়া, আমি সত্যি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, আমরা পুরো পরিবার ধরে ঘুম নষ্ট করে এভাবে একটি পাগলী দেখতে যাব।'

'আমরা পাগলী দেখতে যাচ্ছি না বরং ওই পথে হাঁটতে যাচ্ছি। যেহেতু ও পথে যাচ্ছি, তাই একবার দেখব ঘটনা কী।'

'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই, মায়ের পেটের ভাবী তারা কীভাবে আবীর ভাইয়ার পাগলামিকে সমর্থন করে।'

'কী বললি মায়ের পেটের ভাবী, হে হে হে!! মায়ের পেটের ভাবী, হো হো হো!'

মায়া সজোরে প্রাণ খুলে হাসতে থাকে, ওকে সুন্দর দেখায়। রোদ বিরক্ত হয়। গতকাল রাত জেগে না পড়ে এই মেয়েটার জন্য ও কবিতা লিখেছে। লেখা ঠিক হয়নি সময় নষ্ট হয়েছে, পরিশ্রম জলে গেছে।

'হাসিস না তো, বিরক্ত লাগে।'

মায়া মন খুলে খানিক হাসে। গুনগুন করে কোনো একটা গান গায়। চারপাশে কুয়াশারা আরো ঘন হচ্ছে। ঘন কুয়াশা তুষারের মতো ঝিরঝির

করে গায়ে এসে লাগছে। স্বর্গ নিশ্চয়ই এমন সুন্দর কিছুই হবে। তুষার থাকবে কিন্তু শীত থাকবে না, মায়া ভাবে।

'আজকের দিনটা খুব সুন্দর, তাই না রোদ?'

রোদ চুপ থাকে, কথা বলে না। শীতকাল কোনো ঋতুর মধ্যে পড়ে? আর্দ্রতাহীনতায় পা ফাটে, গা ফাটে, পত্রঝরা বৃক্ষের সবুজ পাতা ঝরে ঝরে পড়ে, গোসল করতে কষ্ট হয়। সাক্ষাৎ দোজখের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু মায়াকে এসব বললে ও যুক্তি মানবে না, কারণ শুনবে না। অযথাই এ-কথা সে-কথা একসঙ্গে করে ঝগড়া বাধাবে, চিৎকার করবে।

'কী হলো, কী বললাম শুনতে পাসনি?'

'হুম, আজকের দিনটা সুন্দর।'

মায়া হাসে, ওকে খুশি দেখায়।

'গতকাল গোসল করেছিলি?'

রোদ চুপ করে থাকে, কথা বলে না।

'গতকাল গোসল করেছিলি?'

'না, শীতকালে প্রতিদিন গোসল করা যায়!'

'ছিঃ, তুই এত নোংরা কেন?'

'ছিঃ ছিঃ করার মতো কিছু হয়নি। তুই যত নোংরা বলছিস তত নোংরাও নই। শুক্রবারে গোসল করে নামাজ পড়তে গিয়েছি, বিকেলে আবার ভিজেছি, তার মানে একদিনে দুইবার গোসল। এসব তো খেয়াল করবি না।'

'নোংরা না তো কী, ঠিক সময়ে গোসল করিস না, সময়মতো ঘুমাস না। গা-হাত-পা নোংরা করে রাখিস।'

'ছেলেরা একটু নোংরাই হয়, এটা তোকে মেনে নিতে হবে। অনেকে আছে মনে নোংরা নিয়ে সকাল-বিকাল সাবান ঘষে, আমি অন্তত তাদের চেয়ে পরিষ্কার।'

মায়া সহজেই হাল ছেড়ে দেয়, চুপচাপ খানিক দূর হাঁটে। প্রসঙ্গ বদলে বলে,

'আচ্ছা রোদ তোর কী মনে হয় পাগলীর কোনো ক্ষমতা আছে?'

'ধুর, তাই সম্ভব নাকি? আদিভৌতিক, অলৌকিক সব শক্তিই ভুয়া, এসব দুর্বল মানুষদের জন্য।'

'তাহলে আবীরদা যা বলছে সব মিথ্যা?'

'অবশ্যই মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?'

‘১০০% নিশ্চিত আমি।’

‘তোর কী ধারণা? ওর উদ্দেশ্য কী?’

রোদ কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠোঁট উল্টায়।

‘ধারণা নেই।’

“ধারণা করতে বলেছি ধারণা করবি, ‘ধারণা নেই’ তো ধারণার মধ্যে পড়ে না, তাই না?”

‘হুম তা ঠিক, পড়ে না।’

‘কী মনে হয় ও এসব করছে কেন?’

রোদ খানিক চুপ থাকে, ভাবতে ভাবতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,

‘আমার মনে হয় এখান থেকে ও ব্যবসা করে টাকা-পয়সা আয় করবে। ভেবে দেখ দিনে ১০০ জন মানুষ পঞ্চাশ পয়সা করে দিলেও পঞ্চাশ টাকা, তার মানে মাসে পনেরশ টাকা। একেবারে কম কিছু নয়।’

মায়া হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। এক হাত কোমরে দিয়ে অন্য হাতের আঙুল নাচিয়ে বলে,

‘কী বললি তুই?’

‘বলছি দিনে পঞ্চাশ টাকা হলে...’

‘চুপ, একদম চুপ।’

‘আচ্ছা।’

‘ও এরকম না, মানুষকে একটু মূল্যায়ন করতে শেখ।’

‘ধারণা করতে বললি ধারণা করলাম, আমার কী দোষ?’

‘ধারণা করতে বলেছি কিন্তু নোংরা কিছু তো বলতে বলিনি?’

‘হুম।’

‘উল্টাপাল্টা হোক, একটু পাগল হোক, ভাই তো আমার। তাছাড়া ওর মনমানসিকতা ভালো।’

‘ও পাগল? তাহলেই হয়েছে।’

‘পাগল হোক না হোক, নোংরামি নেই নিশ্চয়ই?’

‘হুম।’

‘হুম হুম করিস না তো, গা জ্বলে।’

‘আচ্ছা করব না।’

দু’জন আবার চুপচাপ হাঁটতে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়ার রাগ পড়ে যায়। শীত সহ্য হয় না রোদের। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠতে রাজি হয়নি। জোর করে ডেকে তুলেছে, হাঁটতে নিয়ে বেরিয়েছে। এভাবে রাস্তার মধ্যে

ওকে না বকলেই হতো। মায়ার আফসোস হতে থাকে।

'রাগ করলি রোদ?'

রোদ মায়ার দিকে তাকিয়ে হাসে। মায়ার সঙ্গে চলার এই সুবিধা। বকবে, ঝগড়া করবে, চিৎকার করবে, একটু পরে নিজেই কষ্ট পাবে, অনুতাপ করবে। মন ভালো করার জন্য ছেলেমানুষি করবে।

'নাহ, রাগ করিনি।'

'তাহলে ভালোবাসি বল।'

'ভালোবাসি।'

'এভাবে না, সুন্দর করে ভালোবাসি বল।'

'সুন্দর করে ভালোবাসি।'

'তুই কি আমাকে রাগানোর চেষ্টা করছিস?'

'হুম।'

'থাক বলতে হবে না ভালোবাসি।'

দু'জনে খানিক চুপ থাকে। মায়ার কমে যাওয়া রাগ আবার বাড়তে থাকে। রোদ ওকে রাগিয়ে মজা পায়।

'গতকাল রাতে তোকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি, পড়বি?'

'হ্যাঁ পড়ব।'

'কবিতাটা রাতে পড়িস, রাতের কবিতা দিনে পড়লে মানায়!'

'না আমাকে নিয়ে লেখা কবিতা আমি যখন ইচ্ছা পড়ব। আমার এখন পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে, এখন দিতে হবে।'

রোদ পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মায়ার হাতে দেয়। রোদের হাতের লেখা সুন্দর। মায়া হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে।

আজ আলো ঝলমলে রাতে, চল পালাই এক সাথে
মিলব দুজন, মিশব নদে, কুয়াশার প্রভাতে।
তোর খুচরো যত দেনা, আমার উড়ুউড়ু কল্পনা
কেবল মিটিয়ে দিবি, সঙ্গে নিবি একটাই প্রার্থনা।
খুশি লাগছে লাগছে খুব, ভাবনার আড়াই লক্ষ রূপ
বলবো আমি শুনবি তুই, একদম চুপ চুপ।
ভাবছি যান্ত্রিকতার তাড়ায়, যদি হঠাৎ কোথাও হারাই,
লোকালয় ফেলে খুঁজবি তো হিমালয়, সাহারায়?
বা যদি শালিক হঠাৎ নাচে, ভালোবাসার নরম আঁচে
সিন্ধু পেলেও বলবি তো প্রেম আছে প্রেম আছে?

‘বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে।’

‘সত্যি সুন্দর?’

‘তো, আমি তোর মতো মিথ্যাবাদী নাকি?’

‘কবিতায় তোর জন্য একটা চমক আছে, ধাঁধা বলতে পারিস। খুঁজে দেখ পাস কিনা।’

মায়া কিছুক্ষণ কবিতার দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকে। খুঁজে না পেয়ে হাল ছেড়ে দেয়।

‘ধুর জানি না, বল কী মেসেজ?’

‘বলা যাবে না।’

‘না না বল, বল, বল।’

‘আরেকটু চেষ্টা কর।’

‘অনেক চেষ্টা করেছি আর করা যাবে না, বল কিন্তু।’

‘কবিতার প্রত্যেক লাইনের প্রথম অক্ষর একসঙ্গে নিয়ে পড়।’

মায়া কবিতার দিকে চেয়ে থাকে, অবাক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

‘আমি তোকে খুব ভালোবাসি?’

‘ইয়েস ম্যাডাম, আমি তোকে খুব ভালোবাসি।’

মায়ার চোখ আনন্দে চিকচিক করে ওঠে। মুখের চামড়া কুঁচকে যায় চোখের কাছে।

‘আমিও তোকে খুব ভালোবাসি রে রোদ। রাগ একটু বেশি তো, বকাঝকা করি। তাই বলে ভালো কিন্তু কম বাসি না, এটা তোকে মেনে নিতে হবে।’

‘জানি তো।’

‘তোকে আমার খুব জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে জানিস, যখনই ইচ্ছা হয় কেউ না কেউ থাকে। তুই বুঝে নে আমি তোকে জড়িয়ে ধরেছি, ঠিক আছে?’

রোদ লাজুক হাসে। মায়ার চুলে শীতের শিশির জমেছে, সেগুলো ভেঙে দিতে দিতে বলে,

‘ঠিক আছে ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে।’

১২

পাগলী দেখতে এসে সবচেয়ে বেশি অবাক হলো বেলা। কিশোরী একটি মেয়ে আগুনকে সামনে রেখে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে আছে। আশপাশে আগরবাতি, গোলাপজলের বোতল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যত্রতত্র। মেয়েটির খানিক পেছনে দু'পাশে দু'জন বসা। একজন পুরুষ, একজন মহিলা, তাঁরা দুজন স্বামী-স্ত্রী। দু'জনেরই পরনে লাল টকটকে ধুতির মতো পোশাক। দেখতে খুব অদ্ভুত লাগে। নতুন একটা লাল শাড়ি পরেছে পাগলী, কেউ দিয়েছে নিশ্চয়ই।

বেলা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। গোলগাল বিশেষত্বহীন চেহারা পাগলীর। মাথার চুলগুলো শ্যাম্পু করে ভালো করে গোসল করালে দিব্বি গৃহস্থ বাড়ির বোকাসোকা বউ বলে চালিয়ে দেয়া যায়। সে আগুনের সামনে বসে ঘুমে ঢুলে পড়ছে, হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠছে। কখনো পিটপিট করে আগুনের দিকে তাকাচ্ছে, কখনো আকাশের দিকে। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি হঠাৎ আসছে, হঠাৎ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পাগলীর মাঝে অলৌকিকতার কোনো ছায়া বেলার চোখে পড়ে না। তাঁর পাশে বসে থাকা দু'জন উঠে আসে।

'মা তো এখন অগ্নি সাধনা করছেন। আপনারা কিছু বলতে চাইলে সাধনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন। না হলে আমাদের বলতে পারেন আমরা উনার খাদেম, খবরাখবর পৌঁছে দেই।'

পাগলী হঠাৎ চোখ খুলে নড়ে-চড়ে বসে। লাল ধুতির মতো পোশাক পরা দম্পতিদের দিকে তাকায়। সামনে তেঁতুল গাছের কাঠ পড়ে ছিল, সেটা হাতে তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুড়ে মারে।

'তোরা আবার আসছিস, যা কুত্তা, যা যা, মর কুত্তা দূর হ, আর আসবি না কুত্তার দল।'

লোকটা এবং তাঁর বউ তড়িঘড়ি করে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। বেলা হাসিহাসি

মুখ নিয়ে পাগলীর দিকে এগিয়ে যায়। রাশেদ বেলার হাত চেপে ধরে বাধা দেয়।

'কাছে যেও না বেলা, কোথায় কী ছুড়ে মারে ব্যথা পাবে।'

বেলা রাশেদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হাসে।

'কিচ্ছু হবে না।'

'না বেলা, দেখা তো হলো চলো যাই।'

'রাশেদ বিশ্বাস করো কিচ্ছু হবে না।'

বেলা হাসি হাসি মুখ নিয়ে পাগলীর চোখে চোখ রেখে এগিয়ে যায়। পাগলীর সামনে বসতে বসতে বলে

'নাম কী তোমার?'

পাগলীটা বেলার দিকে চেয়ে হাসে, কথা বলে না।

'পাউরুটি খাবে, এনে দেব?'

পাগলী মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়।

'নারকেলের নাড়ু খাবে?'

'খাব, দাও।'

বেলা আসার সময় টিফিন বাটিতে করে কিছু নাড়ু সঙ্গে এনেছিল। সেখান থেকে দুটো নাড়ু পাগলীর হাতে দেয়, পাগলী আগ্রহ করে খায়। বেলা চুপচাপ চেয়ে দেখে। নাড়ু দুটো শেষ করে পাগলী নিজের আঙুলে লেগে থাকা নাড়ুর গুঁড়োও চেটে খায়।

'আর নাড়ু নাই?'

'হ্যাঁ, অনেক আছে।'

'দাও, খাব।'

'এসব তোমার, তুমি খাবে, আচ্ছা?'

বেলা টিফিন বাটি পুরোটাই পাগলীর হাতে তুলে দেয়। পাগলী এদিক-ওদিক দেখে। কোলের মধ্যে টিফিন বাটি লুকিয়ে রাখে। ওটা ও কাউকে দেবে না, একা একা খাবে।

'আচ্ছা।'

পাগলী আলতো করে বেলার মুখে হাত দেয়। বেলার কানে লাল পাথরের দুল। সেটা যত্ন করে নেড়ে-চেড়ে দেখে।

'দুল নেবে?'

পাগলী জোরেজোরে আনন্দে মাথা ঝাঁকায়।

'নেব নেব, দুল নেব।'

বেলা ওর কানের দুল খুলে পাগলীর কানে পরিয়ে দেয়। খুশিতে পাগলী হাসে, হাততালি দেয়, দাঁড়িয়ে লাফায়।

'বাহ, খুব সুন্দর লাগছে তো তোমায়।'

পাগলী আরো জোরে লাফায়। এই লাফ আনন্দের, শর্তহীন ভালোবাসা পাওয়ার। লাফাতে লাফাতে বলে,

'সুন্দর, সুন্দর, খুব সুন্দর। সুন্দর সুন্দর, খুব সুন্দর।'

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আবীর, রাশেদ, মায়া আর রোদ চুপচাপ সবকিছু দেখে। বেলা পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসে। সবাইকে ভেদ করে আবীরের চোখে চোখ রেখে হাসে। ওই হাসিতে পাগলীকে নিয়ে গুজব ছড়ানোর প্রতিবাদে সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্য ছিল, আবীর ধরতে পারে। বেলাকে হঠাৎ রহস্যময় মনে হয়। আবীর ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। এই ভয়ের শেকড় নিজের অস্তিত্বকে আগলে রাখার, সত্য গোপন করার। মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে আটকে থাকা নির্মম অথচ কঠিন সত্য আবীরকে তোলপাড় করে দেয়। বহু বছরের পুরনো সত্য হঠাৎ মিথ্যার দেয়াল ভেদ করে উঠে আসতে চাইছে। আবীর যে সত্য প্রকাশ হতে দেবে না, জীবন দিয়ে হলেও আগলে রাখবে।

১৩

কোথা থেকে যেন ঘণ্টা বাজার শব্দ হচ্ছে। শব্দটা বড্ড অদ্ভুত, ঢং ঢং-এর পরিবর্তে খক খক। রোদ শব্দটার দিকে এগিয়ে যেতে চায়, পারে না। পা দুটো অস্বাভাবিক ভারী মনে হয়। অবশ হয়ে আসতে চায়, ক্লান্ত লাগে, অস্বস্তি হয়। অপরিচিত কেউ একজন দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে আর ওর নাম ধরে ডাকছে। ছেলে না মেয়ে বোঝার উপায় নেই। প্রচণ্ড ঘুমে চোখের পাতা তুলতে পারছে না। পায়ের নিচে কে যেন শীতলপাটি বিছিয়ে রেখেছে। রোদ কোনোকিছু না ভেবে থেমে যায়, শুয়ে পড়ে। চোখের পাতা আরো ভারী হয়, অস্বস্তি বাড়তে থাকে।

'রোদ, এই রোদ, রোদ। ওঠ, ওঠ।'

রোদ জেগে ওঠে, স্বস্তি ফিরে পায়। রোদ, রোদ বলে বেলা ওকে ডাকছে। দরজার ওপাশে রাশেদ দাঁড়িয়ে খক খক করে কাশছে। সবকিছু পরিষ্কার হয়। ঘুমের মধ্যে 'ঘুমের স্বপ্ন' দেখা বড় যন্ত্রণাদায়ক।

'বিকেল করে ঘুমাচ্ছিস কেন?'

'পরীক্ষা তো শেষ ভাবী, আর একটু ঘুমাতে দিতে।'

'অনেক দিয়েছি। সেই দুপুর থেকে ঘুমচ্ছিস, আর ঘুমাতে হবে না, উঠে পড়।'

রোদ কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকে। বেলা রোদের চুলে হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে। ওর চুল বড় হয়েছে, বড় চুলে অন্যরকম লাগছে ওকে।

'চুলের এ কী অবস্থা করেছিস বল তো, কাটাবি না?'

'হুম কাল কাটাব।'

'গতকালও না বললি কাল কাটাব?'

রোদ অপরাধের হাসি হাসতে হাসতে বলে

'ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম তো, ঠিক পাইনি। কাল কাটাব।'

'কালও ভুলে যাবি না তো?'

'না না ভুলব না, দেখো।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে।'

রোদ আবার হাসতে হাসতে হাই তোলে। ওর হাসি সুন্দর, পবিত্রতা ছুঁয়ে যায়।

'যা হাত-মুখ ধুয়ে চট করে উঠানে চলে আয়, একটা দারুণ খবর আছে।'

দারুণ খবর শুনতেই রোদের চোখ চকচক করে ওঠে। মুহূর্তে ঘুম উবে যায়।

'কী দারুণ খবর ভাবী?'

'আগে হাত-মুখ ধুয়ে আস তারপর বলছি।'

'না না, আগে বলো তারপর যাব।'

'উহু একদম না। আগে হাত-মুখ ধুবি, চুল আঁচড়াবি তারপর।'

বেলা হাত ধরে রোদকে টেনে তোলে। রোদ দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে বাইরে এসে চারপাশে তাকায়। পরিষ্কার ঝকঝকে বিকেল, বাতাসে হালকা শীত ভাব। শীত যাব যাব করেও যেতে চাচ্ছে না। উঠানের দক্ষিণে মার হাতে লাগানো আমড়া গাছ। তাতে ফল আছে, পাতা নেই। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে গাছটাকে। ওটার নিচে বেলা আর রাশেদ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, বেশ লাগছে ওদের। বেলার হাতে খবরের কাগজ, রাশেদের হাতে হলুদ একটি খাম।

'ভাইয়া, তোমার চাকরি হলো নাকি?'

রাশেদ হাসে, কাশে।

'কই না তো।'

'ও! হাতে খাম দেখে ভাবলাম জয়েনিং লেটার।'

রাশেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভালো একটা চাকরির জন্য মুহূর্তে মন কেমন করে ওঠে, হতাশা ভিড় করে।

'না রে ভাই এখনো রেজাল্ট হয়নি।'

'চিঠি কিসের?'

রাশেদ হাসে, বেলাকেও খুশি দেখায়।

'এটা আমার না তোর চিঠি।'

রোদ অবাক হয়, ভ্রু কুঁচকে বলে

'আমার, আমাকে কে চিঠি লিখবে!'

বেলা রোদের কাছে এসে ওকে ভালো করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে।

'কী দেখ ভাবী?'

‘তোকে, কত্ত বড় হয়ে গেছিস তাই দেখি। এবার তোকে অনেকেই চিঠি লিখবে, বুঝলি ভাইটা?’

রোদ ঠোঁট উল্টে কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বোকার মতো হাসে।

‘বুঝিনি।’

‘বুঝবি বুঝবি, তার আগে এটা পড়ে দেখ।’

বেলা খবরের কাগজ রোদের হাতে দেয়। সাহিত্য পাতার শুরুতে একটি কবিতা দেখে চোখ আটকে যায়। রোদের চোখ চকচক করে ওঠে। মার লেখা কবিতা, রোদ বিড়বিড় করে পড়ে।

দুই ঘর
মাহমুদা হক
স্বপ্নের শুরু হলো রাত জুড়ে আছি,
আকাশ আর মাটিতে সবখানে বাঁচি।
নিচে কেউ গায় গান উপরেতে হাসে,
গানে তো ঘুম ঘুম যাবে দূর বাসে।
আমি তো দেখি না কিছু, তবু বলি ওগো,
তুমি কি ঘুমাও, নাকি ঘুমহীন জাগো?
আমার তো দুই ঘর, মানব আর পিশাচ,
একে অন্যের সাথে করি সহবাস।

রোদ পরম মমতা নিয়ে কবিতার উপরে হাত বোলায়। যেন কবিতা নয়, মাকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। ওর মন কেমন কেমন করে। মা বেঁচে নেই, কবিতা রয়ে গেল। এ এক অদ্ভুত বেঁচে থাকা।

‘ভাবি এ তো মার কবিতা, কিন্তু কীভাবে!’

রোদের অবাক হওয়ার তখনো অনেক বাকি। আজ বড় আনন্দের দিন, বেলা ভাবে।

‘কীভাবে সেটা জানবি, তবে তার আগে পরের পাতা উল্টা।’

পরের পাতা উল্টে রোদ রীতিমতো ধাক্কা খায়। ওর চোখ নিয়ন বাতির মতো জ্বলে ওঠে। মুখ হাঁ হয়ে যায়। এও সম্ভব! ওর নিজের লেখা কবিতা। কিছুদিন আগে মায়াকে উদ্দেশ করে লিখেছিল। ঝড়ের রাতে হারিয়ে গেছে ভেবে খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছিল ওটা। সেটা ‘আমাকেও তুমি সাথে নিও’ শিরোনামে ছেপেছে।

‘হায় আল্লাহ এটা কীভাবে হলো! এটা তো হারিয়ে গিয়েছিল।’

‘হারায়নি হারায়নি, সব ছিল। ঝড়ের রাতে বারান্দা থেকে কুড়িয়ে আমি তুলে রেখেছিলাম।’

‘কিন্তু বারান্দা থেকে সোজা এত বড় দৈনিকের সাহিত্য পাতায়! কীভাবে এটা সম্ভব হলো। বলো না ভাবী, বল না।’

‘বলছি বলছি শোন।’

বেলা বলতে থাকে, রোদ অবাক তাকিয়ে রয়।

‘তোর আর মার কিছু কবিতা আমি আর তোর ভাইয়া কয়েকটা দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায় আর বড় কিছু প্রকাশনীর ঠিকানায় পাঠিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল ওরা যদি পড়ে দেখে তবে নিশ্চয় ভালো লাগবে, ছাপাবেই ছাপাবে আর হলো তাই। কেবল তা-ই নয়, আরো চমক আছে।’

‘আরো চমক, বলো কী!’

‘ইয়েস স্যার, পরের চমকের কাছে এই দুইটা কিছুই নয়।’

রোদ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। রাশেদ খাম হাতে এগিয়ে আসে। ওটা রোদের হাতে দিতে দিতে বলে,

‘নে পড়, দেখ কে তোকে চিঠি লিখেছে।’

রোদ ওটা খুলে দেখে। ভিন্নমাত্রা প্রকাশনের মনোগ্রাম আঁকা হলুদ খাম। তার মধ্যে মোটা, ভারী শক্ত কাগজে টাইপ করা চিঠি। রোদ নেড়ে চেড়ে দেখে।

প্রিয় কবি,

আশা করি ভালো আছেন। আপনার এবং আপনার মায়ের পাণ্ডুলিপি দুটোই আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। আমি পাণ্ডুলিপি দু’খানা পড়েছি। আপনাদের কবিতা আমার ভালো লেগেছে। আমরা আসন্ন বইমেলাতে আপনাদের দু’জনের কবিতা একমলাটে ছাপাতে ইচ্ছুক। রয়্যালটি বাবদ উপযুক্ত সম্মানী আপনারা পাবেন। আশা করি আপনাদের তাতে কোনো আপত্তি নেই।

ধন্যবাদান্তে
ইকবাল মাহমুদ
প্রকাশক, ভিন্নমাত্রা প্রকাশন।
বাংলাবাজার, ঢাকা।

রোদ একবার বেলার দিকে, একবার রাশেদের দিকে তাকায়। কিছুই বিশ্বাস হতে চায় না। এসব স্বপ্ন নয়তো? নিশ্চয় তাই। এখনই ঘুম ভেঙে

গিয়ে কষ্ট পাবে বেচারা। কাউকে বলতেও পারবে না, লজ্জা পাবে খারাপ লাগবে। রোদ নিজের গায়ে চিমটি কাটে, ব্যথা লাগছে, জ্বালাও করছে। জীবনে প্রথমবার ব্যথার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়। এ আনন্দ প্রতিভা প্রকাশের, নিজের যোগ্যতাকে প্রকাশ করার। রোদ আকাশের দিকে উদাসীনভাবে চেয়ে দেখে। বিশাল শূন্যতায় মাকে খোঁজে। মা নেই, থাকার কথাও নয়।

১৪

পত্রিকার সাহিত্য পাতা আর চিঠি সঙ্গে নিয়ে রোদ মায়াকে খোঁজে। মায়া সব সময় ওকে সফল দেখতে চেয়েছে। রোদ নিজেও কম চেষ্টা করেনি, তবু দিন শেষে সবাই ওকে নিয়ে হতাশ হয়েছে। লেখাপড়া ঠিক হতে চায় না ওর। একটি কবিতা কিংবা বই প্রকাশ হয়তো তেমন কিছুই নয়। হয়তো এসব বিশাল কিছু এনে দেবে না। তবু বারবার ধাক্কা খাওয়া ছেলেটির জন্য, তাঁর প্রিয়জনদের জন্য এ অনেক বড় পাওয়া, অনেক গর্বের।

মায়াকে ঘরে, ছাদে কিংবা বাড়ির কোথাও পাওয়া গেল না। বাড়ির পেছন দিকে কালো একটা চাদর পরে চুপচাপ পুকুর পাড়ে বসে কী যেন ভাবছে ও। শেষ বিকেলের সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। একটা বুলবুলি পাখি পাকা একটা পেঁপে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। সব পাখির নিড়ে ফেরার তাড়া আছে কেবল ওটার নেই।

'এই মায়া, তুই এখানে আর আমি তোকে সারা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

মায়া হাসি হাসিমুখ করে পেছনে ফেরে। রোদের নিঃশ্বাস ভারী ভারী, মুখ হাসি হাসি। ওর চোখে মুখে আনন্দ।

'বাব্বা এতো খুশি খুশি ভাব, তা খুঁজছিস কেন?'

রোদ হাসতে হাসতে বলে,

'বলা যাবে না, আগে শুনি তোর কী ধারণা?'

'জানি না, ধারণা নেই।'

'চেষ্টা কর।'

'না, চেষ্টায় হবে না, দ্রুত বলে দে।'

'আহা কর না চেষ্টা।'

'ঢং না করে বল তো কী, তাড়াতাড়ি বল, পড়তে বসব।'

'চেষ্টাই তো করলি না পারবি কী করে?'

'পারলে শোনা মাত্র পেরে যেতাম। অত সময় নষ্ট করিসনে তো তাড়াতাড়ি বলে দে।'

রোদ হাল ছেড়ে দেয়। মায়ার হাতে চিঠি আর পত্রিকা দেয়। মায়া দেখে অবাক হয়, আনন্দে ওর বড় বড় হয়ে উঠে।

'ই ই ই..., রোদ।'

'হুম বল।'

'এত্তো বড় পত্রিকায় তোর আর কাকীর কবিতা? এত্তো বড় প্রকাশনী নিজে থেকে তোর বই প্রকাশ করবে?'

রোদ লজ্জায় হাসি হাসি হয়ে বলে,

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তুই তো এবার বিখ্যাত হয়ে যাবি রোদ।'

'আরে নাহ, একটা কবিতার বইতে কিছু হয় নাকি?'

'অবশ্যই হয়, অনেক কিছু হয়। যারা প্রতিভা চেনার একটা বই দেখেই চিনে নেবে।'

'তুই খুশি মায়া?'

'খুশি মানে, আমি মহা খুশি। আমার যে কী করতে মন চাইছে বোঝাতে পারব না।'

'কী করতে মন চাইছে?'

মায়া আশপাশে তাকায়, কেউ নেই। পুকুরের অন্য পাড়ও বড় দেয়ালে ঘেরা, তবুও মায়া রোদের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে,

'তোর ভার্জিনিটি নষ্ট করে দিতে মন চাইছে।'

কথাটা বলে মায়া হো হো করে হাসে, হাসি থামতে চায় না। রোদ চুপ করে চেয়ে থাকে। ওর মুখটাও হাসি হাসি, কেবল কথা খুঁজে পায় না।

মায়া হাসি থামিয়ে চারপাশে তাকায়, কোথাও কেউ নেই। এমন সুযোগ রোজ রোজ আসে না। ও হুট করে রোদকে জড়িয়ে ধরে।

'রোদ অনেক খুশি আমি, অনেক।'

'আমিও।'

মায়া রোদকে আরো শক্ত করে চেপে ধরে ওর চুলে হাত বোলায়, কী মনে করে ঠোঁটে চুমু খায়। যে ঠোঁট ধর্ম জানে না, নিয়ম মানে না, সংস্কারের পরোয়া করে না। কেবল হারিয়ে যেতে জানে।

দূরে ছাদ থেকে দাঁড়িয়ে ইলা মিত্র চুপচাপ মেয়েকে দেখেন। যিনি ধর্ম জানেন, নিয়ম মানেন, সংস্কারকে পূজা করেন। মুহূর্তের মধ্যে তার পরিচিত জগৎ অচেনা মনে হয়। সমস্ত সংস্কার, নৈতিকতা, পরিবেশ সব ভেঙে পড়তে চায়। যে সংস্কারকে তিনি ভাঙতে দেবেন না, জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করবেন।

১৫

মেরুদণ্ড বরাবর প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। তীব্র ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেল রাশেদের। পাশ ফিরতে কষ্ট হচ্ছে, ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পানির পিপাসা বেড়েছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে খুব। ঘরময় অন্ধকার, গত রাতে ঘুমানোর সময় মাথা কোনদিকে ছিল, উত্তরে না দক্ষিণে? রাশেদ মনে করার চেষ্টা করে, মনে পড়ে না।

তীব্র ব্যথা আর তৃষ্ণা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে পানির গ্লাস হাতড়ায়, খুঁজে পায় না। আলো জ্বালালেই হয়, ইচ্ছা করে না। হুট করে আলো চোখে পড়লে বেলার ঘুম ভেঙে যায়। একবার ঘুম ভেঙে গেলে সারারাত জেগে থাকে। এপাশ-ওপাশ করে, আর ঘুম আসে না। অপরাধ বোধ কাজ করে।

হাতের উল্টাপাশে ধাক্কা লেগে টেবিল থেকে গ্লাস মেঝেতে আছড়ে পড়ে। ঝনঝন করে শব্দ হয়, ঘুম ভেঙে যায় বেলার। ও লাফিয়ে ওঠে। মাথার কাছে সুইচ, চেপে ধরে আলো জ্বালাতে জ্বালাতে বলে,

'কী হলো রাশেদ, কী হলো?'

রাশেদ হতাশা নিয়ে নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখে, অবাক হয়। বেলার ঘুম ভাঙল, গ্লাসও ভাঙল।

'গ্লাস হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল।'

'আলো জ্বালাওনি কেন?'

'তোমার ঘুম ভেঙে যায় যদি সেই ভয়ে।'

'ভাঙলে ভাঙত আর ভাঙলও তো।'

রাশেদ চুপ করে থাকে, পিঠে ব্যথা তীব্রতর হচ্ছে, পিপাসাও বাড়ছে। বেয়াদব কাশিও থামিয়ে রাখা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যত কষ্টই হোক, বেলার সামনে কাশা যাবে না, ব্যথা বুঝতে দেয়া যাবে না। সারাদিন মনমরা হয়ে থাকবে তাহলে, ডাক্তার ডাক্তার করে পাগল করে দেবে।

'পানি খেয়েছো?'

'না।'

বেলা উঠে দাঁড়ায়, ধীরপায়ে রান্নাঘরে ঢোকে। রোদের ঘরে আলো জ্বলছে। সারারাত অযথাই জেগে থাকবে আর সকালে ডাকলে উঠতে চাইবে না। বেলা নতুন গ্লাস বের করে, গ্লাস ভর্তি করে পানি রাশেদকে দেয়। এক নিঃশ্বাসে পানি শেষ করে রাশেদ। বেলার খুব মায়া হয় ওকে দেখে।

'আর পানি দেব?'

রাশেদ কিছু না বলে বেলার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে। ওর শাড়ি অগোছালো, খোলা চুল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে বলে,

'কী দেখ?'

'তোমাকে।'

'দেখ না আমায়, এমন খুঁটিয়ে দেখার কী আছে?'

'তোমার অনেক কষ্ট হয়ে যায়, না বেলা?'

'কিসের কষ্ট?'

'এই যে সংসার, বাড়ি-ঘর, আমাদের দেখাশোনা, রান্নাবান্না।'

'ধুর পাগল ছেলে, একদম না।'

'জানতাম স্বীকার করবে না।'

'সত্য হলে না করতাম, তাই না?'

'কী জানি!'

'রাশেদ, এই ঘর আমার, এই সমস্ত পরিবার আমার, আমাদের, আমার সন্তানের। এখানকার সবকিছু আমার নিজের মনের মতো করে সাজানো। তোমরাই আমার স্বর্গ, এগুলোই আমার সুখ।'

'আর কষ্টগুলো? খাটাখাটনি?'

'তোমরা আমায় সারাদিন একদম বাড়াবাড়ি পর্যায়ে সাহায্য করো। কখনো তুমি তরকারি কেটে দাও তো রোদ ডিম ভেজে দেয়। রোদ ডিম ভেজে দেয় তো আবীর ভাইয়া চাল ধুয়ে দেয়। আমার তো সমস্ত ব্যাপারটা পিকনিকের মতো মনে হয়।'

'সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

রাশেদ হাসে। জগ থেকে আরেক গ্লাস পানি ঢেলে, চুমুক দেয়। পানি কাজে দিয়েছে, পিঠের ব্যথা কমেছে তবে ফুরিয়ে যায়নি। না কেশে থাকা

যাচ্ছে, লুকানো যাচ্ছে।

'এই জানো, বাবু না নড়াচড়া শুরু করেছে।'

রাশেদের চোখ আনন্দে ঝলমল করে ওঠে।

'তাই নাকি, বলো কী?'

'হ্যাঁ, আমি অনুভব করতে পারি, হাত দাও তুমিও বুঝবে।'

রাশেদ আলতো করে বেলার তলপেটে হাত রাখে। পেটের ভেতরে নড়াচড়া আরো বেড়ে যায়।

'আরেব্বাবা, বাবার স্পর্শ পেয়ে যে গতি দ্বিগুণ হয়ে গেল রাজপুত্তুরের।'

রাশেদ বেলার কথা শুনে হাসে। বাবা হতে পারার আনন্দের কাছে হিমালয় জয় তুচ্ছ।

'এই, ছেলে হবে না মেয়ে হবে আমাদের?'

'জানি না বেলা।'

'আমার তো মনে হয় ছেলে হবে। ছেলেরা নাকি লাফায় বেশি, বাবু তো সারাদিন লাফায়। একদম অস্থির করে তোলে আমাকে, জানো কিন্তু রোদ বলছে মেয়েই হবে।'

'ছেলে হোক, মেয়ে হোক আমার তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেবল মানুষের মতো মানুষ হোক। বাবু তার মায়ের মতো হোক।'

'না, আমার মতো হতে হবে না। আমি তোমার মতো ভালো না।'

রাশেদ ঘড়ি দেখে, রাত ঠিক ঠিক ৩টা। আবার ঘুমের চেষ্টা করা উচিত। শীত শীত লাগছে ওর। শীত যাব যাব করে যাচ্ছে না। আঙুলের ডগা কেমন ফোলা ফোলা মনে হয়, শীত পুরোপুরি না গেলে ভালো হবে না।

'ঘুমাবে না বেলা?'

'তুমি ঘুমাও আমি রোদকে টাইট করে একটা বকা দিয়ে আসি, তারপর ঘুমাব। পাগলটা সারারাত জেগে থাকবে, সকালে উঠবে না।'

বেলা বাইরে বের হয়। পানি আনতে যাওয়ার সময় রোদ বেলাকে দেখেছে। আলো নিভিয়ে তখনই শুয়ে পড়েছে। বেলা রোদের ঘরের আলো জ্বালে। কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে ও।

'কিরে পাজি ঘুমচ্ছিস?'

রোদের দিক থেকে কোনো উত্তর আসে না, ঘুমিয়ে গেছে বোধহয়।

'আর ঘুমের ভান করতে হবে না, ওঠ।'

রোদ কম্বলের নিচ থেকে উঁকি দেয়। চোখ খুলে হাসতে হাসতে উঠে

বসে।

'ঘুমাসনি কেন?'

'দারুণ একটা বই পড়ছিলাম, একদম মনের মতো।'

'কী বই?'

'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড়, পড়েছো তুমি?'

'হ্যাঁ, অনেক আগে পড়া, সত্যি চমৎকার বই।'

'আমার খুব ইচ্ছা করছে চাঁদের পাহাড়ের পরের পর্ব লিখি। ডিয়েগো অ্যালভারেজের জন্য খুব খারাপ লাগছে জানো।'

'হ্যাঁ, আমারো লেগেছিল। মজার ব্যাপার কী জানিস?'

'কী ভাবী?'

'বিভূতিভূষণ আফ্রিকার এত সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন অথচ তিনি কোনোদিন আফ্রিকায় পা-ই রাখেননি?'

'অ্যাঁ, বলো কী! এত নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন কেবল কল্পনার ওপর ভর করে?'

'কেবল কল্পনা তা ঠিক নয়। বই, পত্রপত্রিকা ঘাঁটতেন নিয়মিত। শিক্ষক ছিলেন তো, আর কল্পনার রঙ তো থাকেই।'

'এই ধরনের আর বই নেই ভাবী?'

'এক কাজ করতে পারিস, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু সিরিজ পড়ে শেষ করতে পারিস, মজা পাবি।'

'ঠিক আছে পড়ব। তুমি জেগে কেন, ঘুমাওনি?'

'ঘুমিয়েছিলাম, তোর ভাইয়া অন্ধকারে খুটখুট করছিল। হুট করে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি গ্লাস ভেঙে মন খারাপ করে বসে আছে। তোকে বকতে এসেছিলাম, না বকে তো দিব্বি গল্প বাঁধিয়ে দিলাম।'

'ভালোই করেছো এসে, তোমার সঙ্গে গল্প করতে ভালোই লাগে।'

'আর ভালো লাগতে হবে না। অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘুমা। সকালে উঠে পড়তে বসবি, না হলে সত্যি বকব।'

রোদ কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। আদুরে এই ছেলেটাকে কখনই বকা হয়ে ওঠে না বেলার। ওকে ঘুমাতে বলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় ও। বাইরে মস্ত বড় চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়েছে। বাবা বড় জ্যোৎস্না বিলাসী ছিলেন। বহু বছর হলো বাবার সঙ্গে বসে চাঁদ দেখা হয় না, গল্প করা হয় না। আচ্ছা, বাবা কি ওকে মনে রেখেছেন নাকি ভুলে গেছেন?

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে রাশেদের মতো বাবারও প্রচণ্ড পানি পিপাসা পেত। এখনো কী পায়? এখনো কী বাবা ঘুম ভেঙে গেলে বেলা, পানি দে তো মা বলে চিৎকার করেন? বেলা উত্তর খোঁজে, পায় না। চুপচাপ বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসতে চায় না, এপাশ-ওপাশ ছটফট করে। রাশেদ ঘুমিয়ে গেছে, ঘুমের মধ্যে একাধারে কাশছে। বেলার খারাপ মন আরো খারাপ হয়ে যায়। পণ করে, পরেরবার ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার সময় রাশেদকেও ডাক্তার দেখাতে হবে, যত বাহানাই করুক ডাক্তার দেখাতে হবে।

১৬

হুড়মুড় করে কোথাও একটা শব্দ হলো, ঘুম ভেঙে গেল চৌধুরী ইরাজুদ্দিনের। ভদ্রলোক কান পেতে থাকেন। শব্দ মিলিয়ে গেছে, রেশ রয়ে গেছে। কিসের শব্দ হলো বোঝার চেষ্টা করেন, বুঝতে পারেন না। হাতঘড়ি দেখেন, ৩টা বেজে ১৭ মিনিট। আবার ঘুমানোর চেষ্টা করেন, একবার ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুম আসতে চায় না।

প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে, পিপাসায় বুকের ভেতর শুকিয়ে আসতে চায়। সন্ধ্যা হলেই মাথার কাছে পানির গ্লাস রেখে দেয় সুফিয়ার মা কিংবা হেলাল, আজ রাখেনি।

'কেউ আছিস, এক গ্লাস পানি দে রে।'

তিনি চিৎকার করে ডাকেন। কেউ শুনতে পেল কিনা বুঝতে পারেন না। বেশ কিছুদিন হলো তিনি খেয়াল করেছেন আজকাল কেউ তাকে আগের মতো গুরুত্ব দেয় না, ডাকলে উত্তর নেয় না, শুনেও না শোনার ভান করে। টাকা দিয়ে এতগুলো মানুষ রাখা। নৈতিকভাবে টাকা বৈধ করার ব্যাপার থাকে, এরা সেটাও করবে না! বুড়ো মানুষটাকে দেখবে না! আফসোস হয়, রাগ লাগে, বিরক্তি বাড়তে থাকে।

আগে অনেক বন্ধু ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু কমেছে, নিঃসঙ্গতা বেড়েছে। তারা এখন আসে না, নিঃসঙ্গ বুড়োকে শেষ বয়সে দেখতে আসা মানে সম্প্রদান কারকে হাসপাতাল খুলে বসা। বন্ধুরা এসব ঝামেলা নিতে চায় না। দিনে দিনে দূরত্ব বাড়ছে, বেঁচে থাকার আগ্রহ কমছে।

ধীরে মশারি তুলে বিছানা থেকে নামেন তিনি। মেঝে বরফের মতো ঠাণ্ডা। শীতে পা দুটো টনটন করে ওঠে। অন্ধকারে লাইটের সুইচ হাতড়ান, খুঁজে পেতে সময় লাগে। মেয়ে বেলার শূন্যতা অনুভব করেন। সবকিছু ঠিক ছিল, হঠাৎ কেমন বদলে গেল। মেয়ের সঙ্গে শেষ কবে কথা হয়েছিল, মনে করার চেষ্টা করেন। অতীত চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে।

নিজের পছন্দে বেকার ছেলেকে বিয়ে করল বেলা, তিনি না করেছিলেন, বাধা দেননি। না করাটাই কাল হলো, দূরত্ব বাড়িয়ে দিল। মেয়ের জন্য প্রথম প্রথম বুকের ভেতর কেমন করত, এখন তা-ও করে না। তিনি অপেক্ষা করেন, বুকের ভেতর শেষ একবার কেমন করে উঠুক, নড়ে উঠুক। তারপর হঠাৎ সব থেমে যাক। নিঃসঙ্গ জীবন মুক্তি পাক মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনে।

তিনি মারা গেলে বেলা কী করবে খুব জানতে ইচ্ছা হয়। ও কী কাঁদবে! বাবার রক্তহীন পাংশু মুখটায় হাত দিয়ে কেঁদে কেঁদে কী বলবে, বাবা, শেষ একবার কপালে চুমু দাও, শব্দ করে। নাকি জেদ বজায় রাখবে! চোখের দেখাও দেখতে আসবে না। নিজের রক্তকে ভীষণ ভয় পান তিনি। ভাঙবে, কষ্ট পাবে, শেষ হয়ে যাবে তবু হার মানবে না।

কয়েকদিন হলো মেয়েকে খুব দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। কাছে ডেকে ছলছল চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে,

'মারে শুনলাম তুই নাকি মা হবি, একবার বুড়ো বাবাকে নিজে থেকে জানাতে তো পারতি। বাবা হয়ে এটুকু তো আমি আশা করি। ভাব তো একবার, আমার জায়গায় তুই, তোর জায়গায় তোর মেয়ে, কী করতি? অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও পারতি নিজের মেয়েকে একটা বেকার ছেলের হাতে তুলে দিতে? মারে, আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি। তুই কি পারিস না একবারের জন্য হলেও অভিমানী আর জেদি বাপটাকে দেখে যেতে। এত অভিমান তোর! আমি আসতে বলি না বলে চোখের দেখা দেখতেও আসবি না!'

বেলাকে প্রায়ই হেলালকে দিয়ে আসতে বলতে ইচ্ছা হয়, বলতে পারেন না। গলার কাছটায় এসে বেধে যায়।

'কাকা, আপনার পানি।'

ভদ্রলোক পাশ ফিরে তাকান। পানি হাতে ঢুলঢুল চোখে হেলাল দাঁড়িয়ে। এক নিঃশ্বাসে পানি শেষ করে বারান্দায় গিয়ে বসেন। বারান্দার ঠিক পাশে পাশাপাশি দুটো জামরুল গাছ। একটা তিনি লাগিয়েছিলেন, একটা বেলা। বেলা সারা বাড়ি গাছ লাগিয়ে রাখত, সবকিছু সাজিয়ে রাখত। বেলা নেই, গাছগুলো রয়ে গেছে। অগোছালো, অযত্নে ভরা ডালপালা ছড়িয়ে আছে এদিক-সেদিক। স্বর্গের মতো সুন্দর বাড়িটা নরক হয়ে আছে। আত্মা মরে গেছে, দেহ পড়ে আছে। এমন বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

গাছের সঙ্গে আপন মনে কথা বলত বেলা। এখনো কথা বলে কিনা জানতে ইচ্ছা হয়, জানা হয় না।

'হেলাল, হেলাল!'

'কাকা।'

'বেলার কোনো খোঁজ জানো? কোনো চিঠি এসেছে ওর?'

'খোঁজ জানি, কোনো চিঠি আসেনি।'

'ভালো করে দেখেছো তো?'

'জি কাকা।'

ইরাজুদ্দিন চুপ থাকেন। দুর্বলতা লুকানোর চেষ্টা করেন, পারেন না।

'কী খোঁজ জানো?'

'আপা নিয়মিত ডাক্তার শাদিয়া সিরাজকে দেখাচ্ছেন। শাদিয়া আপা বলেছেন সব ঠিকঠাক আছে।'

'শাদিয়া সিরাজ ডাক্তার ভালো?'

'জি কাকা, খুব ভালো।'

'ও কি একাই ডাক্তারের কাছে যায়?'

'না, ভাইয়া থাকেন সঙ্গে।'

'বেলা কি শুকিয়ে গেছে?'

'না কাকা।'

'তুমি ভালো করে খেয়াল করেছো তো?'

'জি কাকা, তবে ভাইয়া খানিক শুকিয়েছেন।'

'আচ্ছা যাও ঘুমাও।'

'আপনি ঘুমাবেন না?'

'না ঘুম আর আসবে না। যাওয়ার সময় বারান্দার লাইট বন্ধ করে দিও।'

ইরাজুদ্দিন অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকেন। ঝাঁকে ঝাঁকে অতীত মনকে নাড়া দিয়ে যায়। ছোটবেলায় কোলে উঠতে চাইত না বেলা, সবসময় কাঁধে নিতে হতো। মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হতো। বাবার সামান্য জ্বর হলে সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকত, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। বাবাকে বেলা ভালোবাসত, হয়তো নিজের চেয়েও বেশি। সেই ভালোবাসা বুঝি ফুরিয়ে গেছে। বছর যায় বছর আসে বাবার সঙ্গে দেখা করে না, একবার খোঁজও নেয় না, কীভাবে পারে!

তিনি বারান্দা থেকে নেমে বেলার হাতে লাগানো জামরুল গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ান। আলতো করে গাছটাকে ছুঁয়ে দেন। যেন গাছকে নয় মেয়েকে ছুঁয়ে দিচ্ছেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি সবকিছু ভুলে যান। বুকের ভেতর বহুদিন পর কেমন করে ওঠে। বেলাকে খুব দেখতে ইচ্ছা হয়। পুরনো

অভিমান, জেদ ভেঙে দিতে ইচ্ছা করে।

নিজেকে প্রস্তুত করেন তিনি। মেয়েকে আসতে বলবেন, আজই। নাকি নিজেই যাবেন? বাবাকে হঠাৎ দেখে নিশ্চয় চমকে যাবে বেলা। খালি হাতে যাওয়া যাবে না, মেয়ের বাড়ি বলে কথা। কী কী খেতে ভালোবাসত বেলা মনে করার চেষ্টা করেন।

'হেলাল, হেলাল।'

হেলাল ছুটে আসে।

'জি কাকা।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

'না কাকা।'

হেলাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকেন তিনিও, কথা বলেন না। নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেও গোছাতে পারেন না।

'কিছু লাগবে কাকা?'

'উ-উঃ?'

'আপনার কিছু লাগবে কাকা?'

'না, ঠিক আছে, যাও। বারান্দার লাইটটা বন্ধ করে দিও তো।'

হেলাল চলে যায়। তিনি অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। নিজেকে নিজে সামনে থেকে দেখা যায় না। দেখা গেলে তিনি চরম অভিমানী একজন বাবাকে দেখতেন। যার চোখ ভিজে উঠেছে মেয়ের অনুপস্থিতিতে।

১৭

মায়ার মা ইলা মিত্র দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে আছেন। আবীরকে ডেকে পাঠিয়েছেন অনেকক্ষণ হলো। ২ মিনিটের মধ্যে আসছি বলে ৩০ মিনিট পার হয়েছে, আবীর আসেনি। আসবে সেই সম্ভাবনা প্রবল, তবে দেরি করবে। এসে উল্টাপাল্টা কথা বলবে, বিরক্ত করবে।

ইলা মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করেন। তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে। মায়া গতকাল বিকেলে স্বাভাবিকভাবে রোদকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা কী সাবলীলভাবেই না ঘটে গেল। তিনি কেবল দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। মা হিসেবে তিনি মেয়েকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দিয়েছেন। মেয়ে হিসেবে নয় বরং মানুষ হিসেবে বাঁচতে শিখিয়েছেন। আজ সবকিছু নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। তিনি বারবার ভাবতে থাকেন। তাঁর শিক্ষায় ভুল ছিল কিনা বোঝার চেষ্টা করেন, বুঝতে পারেন না।

ঘাড়ের পেছনে চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। রক্তচাপ বেড়ে গেছে নিশ্চয়। মেয়েটা শেষমেশ মুসলিম ছেলেকে পছন্দ করে বসল? কীভাবে পারল! এত বড় সিদ্ধান্ত এটুকু মেয়ে নিয়ে ফেলল? সমাজের কথা ভাবল না, বাবা-মায়ের সম্মান দেখল না?

'আসব কাকী?'

ইলা মিত্র পেছনে ফিরে তাকান। আবীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আঠারো বছর আগে এভাবে জ্বর নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ও। গোলগাল, ফর্সা মুখ ছিল ওর। প্রচণ্ড জ্বরে গোল গোল চোখ দুটো লাল হয়ে ছিল। ওকে দেখে খুব মায়া হয়েছিল ভদ্রমহিলার। মায়ের মমতা নিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

'নাম কী তোর?'

'আবীর।'

'কোথা থেকে এসেছিস?'

'পানি খাব।'

পানি খাব বলে সেদিন ধপ করে বসে পড়ে আবীর। প্রচণ্ড জ্বরে অজ্ঞান হওয়ার আগে ওটাই ছিল শেষ কথা। আবীর কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কী পরিচয় কোনোদিন বলেনি। প্রশ্ন করলে উদ্ভট উত্তর দিয়েছে, হেসেছে। পাশ কাটিয়ে গেছে। তিনি আদর্শ মায়ের মতো আবীরকে থাকতে দিয়েছেন, খাইয়েছেন। স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন নিজ সন্তান পরিচয়ে। লেখাপড়ায় ভালো ছিল কিন্তু শেষমেশ ধরে রাখল না। তিনি অনেক জোর করেছিলেন, লাভ হয়নি। সেই যে গো ধরে বসল ব্যবসা করব, আর পড়েনি।

'আয় বাবা, বস এখানটায়।'

ইলা মিত্র আবীরকে নিজের পাশে বসতে বলে বিছানার জায়গা করে দেন। আবীর শান্ত হয়ে বসে। কড়া তামাকের গন্ধ নাকে আসছে ভদ্রমহিলার।

'সিগারেট খেয়েছিস?'

'কই, না।'

'গা দিয়ে ভুর ভুর করে সিগারেটের গন্ধ আসছে আবার বলছিস না।'

'আরে সত্যি না। আমি ওসব খাই-টাই না। ব্রাশটা পুরনো হয়েছে, বুঝলে। এতবার ঘষি পরিষ্কার হয় না, তাই রাগ করে গতকাল ফেলে দিয়েছি। সকালে কিনব কিনব করে কেনা হয়নি। আজ আর ব্রাশ করিনি তো, তাই মুখ দিয়ে গন্ধ আসছে হয়তো, আর তুমি ভাবছো সিগারেট।'

'মিথ্যা গুছিয়ে বলতে হয় আবীর। দাঁত ব্রাশ না করলে কী আর সিগারেটের গন্ধ আসে?'

'হুম, তাও ঠিক।'

'তুই এত মিথ্যা বলিস কেন?'

'দেখ কাকী, মিথ্যা খারাপ কিছু না। আমি তো পুরোহিত নই, ওঝা, সাধু গোছেরও কেউ নই। দরকার লাগলে দু'চারটা মিথ্যা বলতেই পারি, তাই না?'

'হুম, তা পারিস।'

'ডেকেছো কেন?'

'কেন, মা হয়ে ছেলেকে এমনি এমনি ডাকতে পারি না?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্যই পারো কিন্তু এমনি এমনি ডাকোনি বুঝতে পারছি। বড় কিছু ঘটনা আছে।'

'হ্যাঁ আছে। মায়ার ব্যাপারে ডেকেছি, কিছু তথ্য দিবি।'

'কী তথ্য?'

'আগে বল, মিথ্যা বলবি না।'

আবীর কিছু না বলে চুপ করে থাকে। ভেতরে ভেতরে হতাশ হয়।

'কথা দে আমায় মিথ্যা বলবি না।'

'আচ্ছা বলব না।'

'মায়া কি কাউকে পছন্দ করে?'

'করে তো। তোমাকে, কাকাকে, বেলা ভাবীকে, রাশেদকে। আমাকে তেমন করে-টরে না মনে হয়। দু'দিন পরপর কুত্তা কুত্তা বলে গালি দেয়।'

'তোকে আমি রসিকতা করার জন্য ডাকিনি। যা বলছি ভালোভাবে ঠিক ঠিক জবাব দে। ও কি কাউকে ভালোবাসে?'

'সেটা ওর কাছে শুনলেই তো হয়, আমাকে প্রশ্ন করে কী হবে?'

'আবীর।'

'হুম বলো।'

'সবকিছু আমার জানা দরকার। মায়া তোর বোন, ওর প্রতি তোরও একটা দায়িত্ব আছে। এটা ওর ভবিষ্যতের প্রশ্ন, আমাদের পরিবারের সম্মানের প্রশ্ন। তোর উচিত ভালোভাবে কথা বলা, মজা করা নয়।'

'হু, বুঝেছি।'

'ও কী রোদকে ভালোবাসে?'

'আমি জানি না।'

'সত্যি জানিস না?'

'সত্যি জানি না।'

'আমার তো মনে হয় বাসে।'

'বাসলে তো ভালোই, বিয়ে দিয়ে দাও। রোদ তো ছেলে ভালো শুধু লেখাপড়া করতে চায় না, তবে মেধা আছে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে ভালো কিছু করবে। জানা-শোনা এমন ভালো ছেলে তো পাবে না। অচেনা কারো হাতে তুলে দেয়ার চেয়ে এটা ভালো, মায়া সুখে থাকবে।'

'তোর কি মাথা ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমার মাথায় অনেক বুদ্ধি, জানোই তো। বছর বছর ব্যবসায় উন্নতি করছি, ভালো ইনকাম করছি। মাথা ঠিক না থাকলে পারতাম নাকি?'

'রোদ মুসলমান, আমরা হিন্দু।'

'তো, নাম-পরিচয়হীন আমাকে ছেলের মর্যাদা দিতে পারছো আর মুসলিম ছেলেকে জামাইয়ের মর্যাদা দিতে পারবে না?'

'আবীর, আজেবাজে কথা বলিস না।'

'আজেবাজে কথা বলছি না, ভেবেচিন্তে সুস্থ মস্তিষ্কে বলছি। আমার ধর্ম কী কাকী?'

'তুই হিন্দু, তুই আমার ছেলে।'

আবীর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

'কাকী, কে বানালো আমাকে হিন্দু, তুমি, সমাজ নাকি ঈশ্বর? সার্টিফিকেটে বাবা-মায়ের জায়গায় তোমার আর কাকার নাম দেয়া। তোমরা হিন্দু বলে আমাকেও হিন্দু হতে হবে?'

'তো কি দাবি করিস তুই মুসলমান?'

'কিছুই দাবি করি না, কেবল মানুষ দাবি করি নিজেকে। ঈশ্বর নিয়ে দলাদলি করার কোনো মানে দেখি না। বিয়ে হওয়ার কথা মানুষে মানুষে, তোমরা বানিয়েছো নিজেদের ধর্মে ধর্মে। সৃষ্টিকর্তা একজন অথচ তোমরা বানিয়েছো হাজারটা।'

'আবীর বোঝার চেষ্টা কর, তোর কথাগুলো শুনতে ভালো লাগতে পারে কিন্তু এটা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়?'

'বিয়ে কেবল একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের হয় না। বিয়ে হয় একটা পরিবারের সঙ্গে আরেক পরিবারের, বিয়ে হয় সামাজিক প্রথায় সমাজের মানুষের মধ্যে।'

'হ্যাঁ, বিয়ে হোক এক ধর্মের সঙ্গে আরেক ধর্মের। উদারভাবে চিন্তা করলেই তো হয়।'

'আবীর একটা মুসলিম ছেলে আর হিন্দু মেয়ের বিয়ে হলে তাঁদের সন্তানের ধর্ম কী হবে?'

'একটা সন্তান পৃথিবীতে আলো নিয়ে আসে কাকী, শুদ্ধতা নিয়ে আসে। আমরা তাদেরকে অপবিত্র করি, নোংরা বানাই। হিন্দু হলে মুসলমানরা গরু খায়, তারা সঠিক নয়। মুসলমান হলে হিন্দুরা শূকর খায় তারা সঠিক নয় এসব শেখাই। এসব বৈষম্য ভিত্তিহীন। মনে পড়ে কাকী, ছোটবেলায় পেয়ারা গাছটার নিচে শীতল পাটিতে বসে তুমি আমাদের পড়াতে, শেখাতে, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। তাহলে একটা শিশু জন্মাক না কেবল

মানুষ পরিচয়ে। নিক না তাঁর ইচ্ছামতো জেনে বুঝে ধর্ম বেছে।'

'তুই কোনটা নিয়েছিস?'

'আমি মানুষ আর ঈশ্বরকে বেছে নিয়েছি, যেই ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, মায়া, রোদ আর তোমাকেও।'

ইলা মিত্র চুপ করে থাকেন, তিনি কোনো কথা খুঁজে পান না, আবীরও কিছু বলে না। সময় বইতে থাকে। ইলা মিত্রের ঘাড়ের ব্যথা তীব্র হয়।

'আমি মায়াকে ওর পিসির বাড়ি পাঠিয়ে দেব, না হয় বিয়ে দিয়ে দেব। লাগলে মেয়েকে খুন করে ফেলব, তবু এত বড় পাপ হতে দেব না।'

আবীর ঘাড় নেড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে। ইলা মিত্র অপমানিত বোধ করেন। অসহায় লাগে নিজেকে, ক্লান্ত মনে হয়, কিছুই ভাবতে ইচ্ছা হয় না।

'কাল সারারাত আমি ঘুমাতে পারিনি। আমার তো ঘাড়ে ব্যথা করছে, তোর কাকা শুনলে স্ট্রোক করে সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই মারা যাবে।'

'না না কাকা মরবে না, কাকার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস।'

'আবীর তুই খোঁজ নে, ওদের মধ্যে সত্যি কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। আমি বেলা আর রাশেদের সঙ্গে কথা বলব ভাবছি।'

'আগেই এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন বলো তো? হয়তো যা ভাবছো তেমন কিছু নয়।'

'উত্তেজিত হওয়ার মতো ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে, না হলে হতাম না।'

'আচ্ছা হও উত্তেজিত। তবে আগেই রাশেদের সঙ্গে কথা বলতে যেও না, মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে কিছু করো।'

'কী করতে বলিস তুই আমায়?'

'চুপ থাকতে বলি। ওরা এবার থার্ড ইয়ারে উঠবে। দু'জনেরই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সময় দাও ওদের। বয়স আরেকটু বাড়লে নিজেদের মতো সবকিছু মানিয়ে নেবে।'

'না, আমি নিজের চোখের সামনে নিজের মেয়ের এত বড় ক্ষতি হতে দেব না।'

'বোঝ না কেন...'

'তোকে আমার ডাকাই ভুল হয়েছে, তুই যা আমার সামনে থেকে, আর আসবি না আমার সামনে।'

আবীর উঠে দাঁড়িয়ে ইলা মিত্রের পা ছুঁয়ে সালাম করে বাইরে বের হয়। সদর দরজার বাইরে একটা কুকুর বসা। আবীর কুকুরটার পাশে বসে। কুকুরটা

সন্দেহ নিয়ে আবীরকে দেখে, মায়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে আবীরকে দেখে।

'এই দাদা, ওভাবে বসে আছিস কেন?'

'কুকুরটার সঙ্গে কথা বলি।'

'কী কথা?'

'ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওর ধর্ম কী?'

'ওওও...'

'কী উত্তর দিল জানিস?'

'কী?'

'বলল, শালা মানুষের বাচ্চা, দূর হ আমার সামনের থেকে।'

১৮

বটতলা মোড় বাস টার্মিনাল যাত্রী ছাউনি। যাত্রী আছে, চেয়ার আছে, ছাউনি নেই। একটি চেয়ারে রাশেদ চুপচাপ বসে। ওর জ্বর জ্বর লাগছে। টার্মিনাল থেকে বাড়ির দূরত্ব ঠিক ঠিক দেড় কিলোমিটার। কয়েকদিন আগেও মিনিট পনের হেঁটে বাড়ি পৌঁছে যেত। ইদানীং সময় লাগে, হাঁটতে কষ্ট হয়। একটু দূরে গেলেই নিঃশ্বাস ভারী হতে থাকে, বাম বুকে ব্যথা করে। ভারী ভারী মনে হয়।

রাশেদ আকাশ দেখে। বসন্তের সাদা ঝকঝকে আকাশ। শীত চলে গেছে, কাশি রয়ে গেছে। পাতাহীন বৃক্ষ আবার নতুন কুঁড়ি ছাড়ছে, চারপাশ সবুজে ভরে উঠছে। রাশেদ এদিক-ওদিক তাকিয়ে পরিচিত মানুষ খোঁজে, পায় না। একা একা হেঁটে বাড়ি পর্যন্ত যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না, বুক ব্যথা করছে।

বেলা রোজ রোজ ডাক্তার ডাক্তার করে পাগল করে তোলে। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই বাড়তি টাকা খরচ। কিছুতেই বুঝতে চায় না। সামান্য কাশির জন্য জমানো টাকা নষ্ট করার মানে হয় না। রাশেদ ভিন্ন কিছু নিয়ে ভাবার চেষ্টা করে, ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করে। দিন গোনে, আর মাত্র কয়টা মাস, তারপর ঘর আলো করে আসবে ওদের সন্তান। হয়তো মেঘ কিংবা সাঁঝ।

রাশেদ ভাবতে থাকে। খানিক বাদে মন খুশিতে ভরে ওঠে। কল্পনার রঙ বদলালে ব্যথার কথা বেমালুম ভুলে যায়। আপন মনে সন্তানের সঙ্গে কথা বলে।

'বাবা, বাবা।'

'মা, মা, বলেন বলেন।'

'বাড়ি যাচ্ছ না কেন বাবা?'

'একা একা হাঁটতে ইচ্ছা করছে না যে।'

'ওওও...'

'তুমি যাবে আমার সঙ্গে বাবাই, হাঁটবে একসঙ্গে?'

'হ্যাঁ, হাঁটব। তুমি হাঁটলেই তো আমার হাঁটা। আমি তো তোমার সঙ্গেই থাকি সবসময়।'

'তাহলে চলো হাঁটি।'

'না না আরেকটু বসো, তোমার না বুকে ব্যথা। একটু বিশ্রাম করো তারপর একসঙ্গে যাব, কেমন?'

'আচ্ছা বাবাই।'

'বাবা, বাবা।'

'হ্যাঁ বাবা, বলো বলো।'

'মা না তোমায় ডাক্তার দেখাতে বলে, তুমি ডাক্তার দেখাও না কেন? ওষুধ খাও না কেন? তুমি কী পাজি বাবা?'

'না না, আমি একদম পাজি বাবা নই, আমি তো লক্ষ্মী বাবা।'

'লক্ষ্মী বাবারা তো ঠিক সময়ে ওষুধ খায়, তুমি তো খাও না।'

'আমার যে ওষুধে কাজ করে না, তিতা ওষুধ খেতে গেলে বমি আসে।'

'না আমি ওসব জানি না, তুমি মাকে আর কষ্ট দেবে না। আজই লক্ষ্মী বাবার মতো ওষুধ খাবে। না হলে আমি আর আসব না, আর কথা বলব না তোমার সঙ্গে।'

'না না, তুমি আসবে, কথা বলবে।'

'তাহলে আজই ওষুধ খাবে, ঠিক আছে?'

রাশেদ মাথা ঝাঁকায়।

'ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে।'

পাশে চেয়ার টানার শব্দে কল্পনায় বাধা পড়ে। রাশেদ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

'কিরে রাশেদ এখানে একা একা বসে মাথা ঝাঁকাচ্ছিস কেন? বাড়ি যাবি না?'

রাশেদ হাসে। আবীরকে দেখে স্বস্তি পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। একসঙ্গে বাড়ির পথে হাঁটতে থাকে।

'যাব, চল হাঁটি।'

'টিউশন ছিল?'

'না, পোস্ট অফিসে এসেছিলাম।'

'হঠাৎ পোস্ট অফিসে?'

'মা আর রোদের পাণ্ডুলিপির ফাইনাল কপি চেয়েছেন প্রকাশক, সেগুলো দিয়ে এলাম।'

'ওর বই তাহলে প্রকাশ হয়েই যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ হচ্ছে, কেবল লেখাপড়া যদি ঠিকভাবে করত।'

'বাদ দে, সবাইকে দিয়ে সব হয় নাকি বল? আমাকে আর তোকে সারাদিন কাগজ-কলম দিয়ে বসিয়ে কুত্তাপেটা করলেও দুই লাইন কবিতা লিখতে পারব না। রোদ তো তাও অনিচ্ছা নিয়ে কম পড়েও বছর বছর পাস করছে।'

'ভাগ্যিস মায়া ছিল, না হলে যে কী হতো!'

'কী আর হতো, বছর বছর ডাব্বা খেত। এক ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে বেকার, অন্য ভাই ডাব্বা খেয়ে বেকার হতো। তা তোর কোনো চিঠি এলো?'

'নাহ! অনেকদিন তো হলো। রেজাল্ট যে কবে হবে!'

'হবে হবে, হলে তখন করার কিছু থাকবে না। এত আশাহত হোস না।'

রাশেদ কিছু বলে না, কেবল মাথা ঝাঁকায়। রাস্তার অন্য পাশে বটগাছের নিচে ছোটখাটো জটলা, দু'জন একসঙ্গে তাকায়। পাগলী বসে আছে। সমস্ত শীতজুড়ে আগুনকে সামনে নিয়ে সে বসে থেকেছে। তাই থেকে সাধারণ বিশেষত্বহীন মানসিক প্রতিবন্ধীর নাম পরিবর্তন হয় অগ্নি সাধিকা। তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অগ্নি সাধিকার মাজার। এলাকার একদল মানুষ অগ্নি সাধিকাকে নিয়ে বিরক্ত, সবচেয়ে বেশি বিরক্ত আবীর নিজে। ওর সাধারণ মিথ্যায় একটা মাজার দাঁড়িয়ে যাবে ও নিজেও ভাবেনি। সংস্কারের জন্য বছরের পর বছর লেগে যায়, কুসংস্কার কত দ্রুতই না ছড়িয়ে পড়ে।

'কাজটা বোধ হয় ঠিক হলো না রে রাশেদ।'

'কোন কাজটা, অগ্নি সাধিকা?'

'হ্যাঁ।'

'মানুষ বড় আজব প্রাণী বুঝলি, সফলতার মধ্যেও হেরে যাওয়ার স্বাদ পায়।'

'নারে সফলতা বা ব্যর্থতা নয়, আমি বোধ হয় বাড়াবাড়ি করে ফেললাম।'

'বাদ দে, তুই তো আর...'

রাশেদের কথা শেষ হয় না, জোরে জোরে কাশতে থাকে। কাশতে কষ্ট হয়, প্রসঙ্গ বদলে যায়।

'তুই তো মনে হচ্ছে কাশতে কাশতে গলা দিয়ে হৃৎপিণ্ড বের করে ফেলবি রাশেদ, ডাক্তার-টাক্তার দেখা।'

'ছাড়, সিজন্যাল কাশিতে গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই।'

'তুই আমার চেয়েও বড় বেহায়া। আমি স্বীকৃত বেহায়া, তুই অস্বীকৃত

এছাড়া কোনো পার্থক্য নেই। সবাই এত বকে, তাও ডাক্তার দেখাস না, আজব লোক বটে তুই।'

রাশেদ শুকনো হাসি হাসে।

'স্বীকার করছিস তাহলে তুই বেহায়া?'

'হুম করছি, সঙ্গে দাবি করছি তুই নিজেও আমার দলের গুপ্ত প্রতিনিধি।'

দু'জন একসঙ্গে হাসতে হাসতে হাঁটতে থাকে। খানিক দূর গিয়ে আবীর কোনো একটা বিষয় নিয়ে মজা করে, রাশেদ ধরতে পারে না। মাথার ভেতরে চিন চিন করছে ওর, বমি বমি লাগছে পা দুটো অবশ হয়ে আসছে, রাশেদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তার পাশে সবুজ ঘাস, তার ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। বাম বুকে তীব্র যন্ত্রণা করছে ওর, বসা মাত্র মেরুদণ্ড বরাবর চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে আবার। আবীর রাশেদকে চেপে ধরে অবাক হয়। ওর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। অথচ কী স্বাভাবিকভাবেই না হাঁটছিল, কথা বলছিল, ওকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি।

'রাশেদ তোর গায়ে তো জ্বর, কষ্ট হচ্ছে তোর?'

রাশেদ হাসতে চেষ্টা করে। বলতে চায়, 'ও কিছু না।' বলতে পারে না। মুখ দিয়ে থু করে থুথু ফেলে। থুথুর পরিবর্তে একদলা রক্ত ঘাসের ওপরে পড়ে। রাশেদ অবাক হয়ে রক্তের দিকে চেয়ে থাকে। চারপাশ বদলে যাচ্ছে, সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে, প্রচণ্ড বমি পাচ্ছে। ও হয় মারা যাচ্ছে কিংবা জ্ঞান হারাচ্ছে।

১৯

বসন্তের শেষ বিকেল। চারপাশ নির্মল সবুজ। নতুন পাতা আর ফুলে ছেয়ে আছে সবকিছু। কোথায় যেন একটা কোকিল পাখি ডাকছে। পাল্লা দিয়ে একটা ছোট্ট কাঠবিড়ালি চিকুর চিকুর করে ডেকেই যাচ্ছে। মন ভালো করা বিচিত্র চারপাশ। বেলা চা হাতে বারান্দার পাশে চৌকিতে বসে। রাশেদ পাশে থাকলে বেশ হতো। দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছে, দ্রুত চলে আসার কথা থাকলেও এখনো আসেনি। কই এমন তো করে না।

'বেলা, কেমন আছিস মা?'

বেলা ফিরে তাকায়। ইলা মিত্র হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলার হাসি ঠিক মায়ার মতোই সুন্দর, দেখতেও ভালো লাগে। কেউ বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই বয়স পঞ্চাশ পার করেছেন। কিশোরী বয়সে তাঁর চেহারাতেও মাস্তান মাস্তান ভাব ছিল। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাস্তান ভাব কেটে গেছে। তিনি এখন মায়াবী চেহারার আদর্শ মা। সময় হয়তো এমনই, সবকিছু বদলে দেয়।

বেলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঠোঁট দুটো বিস্তৃত করে হেসে বলে–

'কাকী, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?'

'আমি ভালো আছি সোনা। শরীর কেমন তোর?'

'আমার শরীর ভালো। বসো এখানটায়, পা তুলে আরাম করে বসো। কী খাবে বলো?'

ইলা মিত্র শান্ত হয়ে বসেন। মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলেন,

'কিছু খাব না রে।'

'না না, তা কেন? সমুচা আছে, ভেজে দেই খাও।'

'না রে পাগলী, কিচ্ছু করতে হবে না। তোর ছেলে হোক তখন খাব। বস আমার পাশে তোর সঙ্গে কথা বলি।'

বেলা ইলা মিত্রের পাশে বসে।

‘রাশেদ কোথায়?’

‘ও তো পোস্ট অফিসে গেছে। একটু পরই চলে আসবে, দরকার কোনো?’

‘না এমনিতেই, তা পোস্ট অফিসে কেন?’

‘রোদ আর মার বই প্রকাশ হবে জানো তো?’

‘হ্যাঁ শুনেছি মায়ার কাছ থেকে। ভিন্নমাত্রা তো অনেক বড় বড় লেখকের বই ছাপে।’

‘প্রকাশক ফাইনাল পাণ্ডুলিপি চেয়েছেন, সেটাই পাঠাতে গেছে।’

‘আচ্ছা আচ্ছা, ও ভালো আছে তো?’

‘ভালো আর কই, সারাদিন খুক খুক করে কাশে তো কাশতেই থাকে। এত বলি তবু ডাক্তার দেখাতে চায় না, ওষুধ খেতে চায় না। ওষুধ খেতে গেলে নাকি বমি আসে। তুমি একবার দেখা হলে বোলো না কাকী, যেন ডাক্তার দেখায়, ও তোমায় খুব মানে।’

‘আচ্ছা বলব। ওষুধে না আমারও বমি আসে, এক কাজ করিস না কেন?’

‘কী?’

‘অ্যালোপ্যাথি ওষুধে যখন এত অ্যালার্জি ভেষজ ওষুধ দিলেই তো পারিস।’

‘কাশির ভেষজ চিকিৎসা কীভাবে করে তাই তো জানি না।’

‘খুব সহজ। গরম দুধের সঙ্গে এক চামচ হলুদ গুঁড়ো গুলিয়ে ঘুমের আগে দিস আরাম পাবে। আর ঘুমের আগে রোজ দুই চামচ করে মধু খাওয়াবি।’

‘আচ্ছা খাওয়াব।’

‘বেলা, তোর বাবার সঙ্গে তোর কথা হয়?’

বেলা চুপ থাকে। কৃত্রিম হাসতে চায় কিন্তু পারে না।

‘বেলা?’

‘বলো কাকী।’

‘বাবার প্রতি রাগ রাখিস না মা, একবার দেখা কর। বয়স হয়েছে উনার। মানুষের বয়স বেড়ে গেলে অভিমানী হয়ে পড়ে। তোর বাবার তো ত্রিকুলে তুই ছাড়া বলতে গেলে কেউ নেই। বুড়ো বয়সে ছেলে কানাডা থাকা আর না থাকা একই কথা। তুই পাশে থাকলে সাহস পাবেন।’

বেলা ঠোঁট চেপে রাখে। গভীর বেদনাবোধ কাজ করে, বুকের ভেতর কোথায় যেন চিনচিন করে ব্যথা হয়।

‘বাবা বেঁচে আছে তাই বুঝছিস না। ভগবান না করুক খারাপ কিছু হয়ে

গেলে তখন চিরকাল পস্তাবি, সারাজীবন কষ্ট পাবি।'

'কাকী জানো আমারো না খুব কষ্ট হয়, তুমি তো সবই জানো। বাবা এতটা বছর হলো রাশেদকে একবারের জন্য যেতে বলেননি। ও যেখানে সম্মান পেল না, সেখানে পা রাখতে বাধে, নিজেকে স্বার্থপর মনে হয়।'

'বাবাই তো, নারে।'

'হুম, যাব কাকী। রাশেদের চাকরি হলে মিষ্টি নিয়ে যাব।'

'সেটা কর যেটা তোর মন করতে চায়।'

বেলা ইলা মিত্রের হাত ধরে বসে থাকে। আকাশের দিকে উদাস চেয়ে থাকে। কষ্ট করে কান্না লুকিয়ে রাখে। বাবাকে বেলা ভালোবাসে। প্রতিদিন মনে হয়, একটাবারের জন্য খোঁজ নিতে, চোখের দেখা অন্তত দেখতে। শুভক্ষণ আসে না, ভালোবাসা পরাজিত থেকে যায়।

'বেলা।'

'হ্যাঁ কাকী।'

'একটা কথা বলব ভাবছিলাম।'

'বলো।'

'কীভাবে বলব সেটাই বুঝছি না।'

ইলা মিত্র ইতস্তত করেন। সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না বলবেন কিনা। আবার না বলে থাকতেও পারেন না।

'কোনো সমস্যা হয়েছে কাকী?'

ইলা মিত্র ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকান।

'হুম, সমস্যা হয়েছে। একবার ভেবেছিলাম বলব না কিন্তু মনে হলো অন্তত তোকে জানানো উচিত।'

'কী হয়েছে বলো তো।'

'বেলা, মায়া আর রোদ যেভাবে মিশছে সেটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।'

বেলা চুপ থাকে। বিষয়টা দীর্ঘদিন হলো ও নিজেও খেয়াল করেছে। কোনোদিন ওদের কোনো ব্যাপারে নিষেধ করেনি, বাড়তি আগ্রহ দেখায়নি। কেবল সময় দিয়েছে, হয়তো আরেকটু বড় হলে বুঝতে শিখলে নিজে থেকে ফিরে আসবে। দিনে দিনে সময় বেড়েছে, বয়স বেড়েছে কেবল ওদের দূরত্ব বাড়েনি।

'তুই বুদ্ধিমতী মেয়ে বেলা, বোধ হয় সবই বুঝতে পারছিস। এর বেশি মনে হয় না তোকে বলার দরকার আছে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'আমি কী করব বল তো মা?'

বেলা উত্তর খুঁজে পায় না, বুঝতে পারে না কী বলা উচিত বা কী করা উচিত।

'কাকী, আমি কি কিছু বলব ওদের?'

'আমি নিজেও জানি না তোকে কী বলতে বলব। শেষ কয়দিন আমি এক বিন্দু ঘুমাতে পারিনি। ওরা এক ধর্মের হতো আমি কোনোদিন বাধা দিতাম না, কিন্তু এ তো বড় পাপ! আমি ভাবতে পারি না, আমার বড্ড অসহায় লাগে নিজেকে।'

'ভেঙে পড়ে না কাকী, আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি।'

'আমি কী ওকে ওর পিসির বাড়ি পাঠিয়ে দেব?'

'তাতে কী কোনো লাভ হবে? মায়া শুনবে এসব? তাছাড়া এত মেধাবী একটা মেয়ে, ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে। এখন যদি হঠাৎ লেখাপড়ায় বাধা পড়ে, সব একেবারে শেষ হয়ে যাবে।'

'ওই ভয়ই পাচ্ছি আমি। কিছু বলব, যদি উল্টাপাল্টা কিছু করে বসে। বংশ জুড়ে পাগল ওরা। ওর ছোট দাদু আত্মহত্যা করে মরেছে। ওর মেজ পিসি সেও সামান্য কারণে বাবার কথায় রাগ করে ফাঁস নিয়েছিল। আমার তো ভাবতেও গা হিম হয়ে আসে। আমি না পারছি কাউকে কিছু বলতে, না পারছি সহ্য করতে। আমার একমাত্র মেয়ে, কোন পাপের শাস্তি যে ভগবান দিচ্ছেন আমি জানি না।'

'শান্ত হও কাকী, আমি দেখছি কী করা যায়।'

ইলা মিত্র বেলার হাত চেপে ধরেন, নিজেকে সঁপে দেন বেলার কাছে। অসহায় বোধ করেন তিনি।

'তুই আমায় বাঁচা মা, কিছু কর। তোর কাকা কিছুই জানে না, শুনলে খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে। এমনিতেই লোকটার হাই ব্লাড সুগার। আমি আর নিতে পারছি না।'

ইলা মিত্র চুপ করে খানিক বসে থাকেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বেলা আর ওর সন্তানদের জন্য আশীর্বাদ করেন।

বেলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করে। উঠানের অন্য পাশে কদম গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। সন্ধ্যা হব হব করছে অথচ রাশেদ, আবীর কেউ ফেরেনি। বেলার অস্বস্তি হচ্ছে, কিছুই ভালো লাগছে

না। মীর বাড়ির জামে মসজিদ থেকে মাগরিবের আজান ভেসে আসছে। বেলা শাড়ির আঁচল দিয়ে চুল ঢাকে। রোদ আর মায়ার জন্য চিন্তা হয়। কিছু একটা করতে হবে ওকে। ধর্মের সঙ্গে ধর্মের লড়াই বড় নিষ্ঠুর। হাজার বছরের পুরনো, অসহনশীল, উন্মাদ এক যুদ্ধ। রক্ত, মৃত্যু, আর নিজেদের সেরা প্রমাণের পৈশাচিক খেলা। সে খেলায় কবে ওরা নিজেরাও অংশ হয়ে গেছে বুঝতেও পারেনি বেলা। এ খেলা থামাতে হবে ওকে, যেকোনো মূল্যে।

২০

কোথা থেকে যেন সুন্দর মিষ্টি বেলি কিংবা রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধ আসছে। গন্ধটা সরাসরি নাক দিয়ে ঢুকে মস্তিষ্কে নাড়া দেয়। রাশেদ পাশ ফেরে, বুকের ব্যথা আগের মতোই আছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, এখন হচ্ছে না। মেরুদণ্ড বরাবর তীব্র ব্যথা ছিল, সেটা আগের চেয়ে কমলেও থেমে যায়নি। সবকিছু মিলিয়ে নিজেকে হালকা মনে হয়, ভালোলাগা কাজ করে।

রাশেদ চোখ খুলে তাকায়। সাদা ঝকঝকে সাজানো ঘর। ঘরের একপাশে টেবিলে অনেকগুলো রজনীগন্ধা ফুল। যে বিছানায় শুয়ে আছে সেটাও সাদা। পাশাপাশি দুটো বিছানা। বেলা আর আবীর অন্য বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। দু'জনেরই চোখের নিচে কালি জমেছে। সারারাত জেগে ছিল মনে হয়। বেলার চোখ ফোলা ফোলা, কেঁদেছে নিশ্চয়ই।

'বেলা, বেলা।'

বেলা খানিক চমকে উঠে দাঁড়ায়। কাছে এসে কপালে হাত দেয়, জ্বর কমেছে রাশেদের।

'কেমন লাগছে রাশেদ?'

'ভালো।'

বেলা রাশেদের হাত চেপে ধরে মুখের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খায়, আবীরও উঠে আসে। রাশেদের কাছে এসে হাই তুলতে তুলতে ওকে নিয়ে মজা করে বলে,

'আমার কি মনে হয় জানো ভাবী?'

'কী?'

'মৃত্যুর পর আমরা যদি দোজখ পাই, আমাদের যদি দোজখের সর্বোচ্চ স্থানেও দেখা হয় আর রাশেদকে বলি, তোর কেমন লাগছে? ও বলবে– খুব ভালো লাগছে, দোজখের আগুনে ওম আছে।'

ওরা তিনজন একসঙ্গে হাসে। হাসতে গেলে বুকে ব্যথা করে রাশেদের।

ওর মাথার পাশে জানালা দিয়ে সকালের নরম আলো আসছে। ব্যথাটুকু অস্বীকার করতে পারলে আজকের সকাল সুন্দর, রাশেদ মনে মনে ভাবে।

'আমার কী হয়েছিল আবীর?'

'শেষ কোন ঘটনা মনে আছে সেটা বল।'

'ঘাসের ওপর বসে কাশতে কাশতে থুথু ফেলেছিলাম। থুথুতে রক্ত ছিল তারপর আর মনে নেই।'

'তারপর কাশতে কাশতে বমি করতে করতে প্রচণ্ড জ্বরে অজ্ঞান হয়ে গেলি। ভ্যান গাড়ি ঠিক করে শুইয়ে আনলাম এখানে। সারারাত জ্বরের ঘোরে উল্টাপাল্টা বকেছিস, এখন কথা বলছিস।'

'ওওও...। তোকে অনেক কষ্ট দিলাম, না রে। সারারাত ঘুমাসনি মনে হচ্ছে।'

আবীর চোখ টিপে হাসে। রাশেদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,

'কোনো ব্যাপার না, তুই তো কেবল আমার বন্ধু না, তুই আমার ভাইও। তোর কিছু হওয়া তো আমারও হওয়া। তবে কাজটা ঠিক করিসনি।'

'কোন কাজ?'

'জ্বর গায়ে ছিল বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বললেই পারতি। একবার বলবি না এটা আশা করিনি? বললে নিশ্চয় এমন ঘটত না।'

রাশেদ কী বলবে বুঝতে পারে না। প্রসঙ্গ বদলে বলে,

'রোদ কোথায়?'

'সারারাত এখানেই ছিল। তোর জ্বর কমার পর বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি, দুপুরে আসবে।'

বেলা চুপচাপ ওদের কথা শোনে, দু'জনকে কাছ থেকে দেখে। সারারাত না ঘুমানোয় আবীরের চোখ লাল হয়ে আছে। বেলা আর রোদকে ঘুমাতে দিয়ে রাশেদের যত্ন করেছে। সারাদিন গোমড়া মুখে কৌতুক করা ছেলেটার মনে এত মায়া, এত আবেগ লুকিয়ে ছিল খারাপ সময় না এলে জানা হতো না।

'আবীর ভাইয়া, সারারাত ঘুমাওনি। তুমি বরং বাড়ি যাও, গোসল করে খেয়ে ঘুম দিয়ে আবার এসো।'

'না, সমস্যা নেই।'

'সমস্যা আছে, যা বলছি করো। তুমি গিয়ে রোদকে পাঠিয়ে দিও, আমি আছি তো রাশেদের পাশে।'

আবীর রাশেদের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে,

'তুই কিছু খাবি রাশেদ, কিছু খেতে ইচ্ছা করে?'

রাশেদের বেশি রসুন দিয়ে ঝাল ঝাল হাঁসের মাংস আর মুগ ডালের খিচুড়ি খেতে খুব ইচ্ছা করে। শীত শেষে হাঁসের গায়ে বাড়তি চর্বি থাকে বলে খেতে বেশ লাগে। মা বেঁচে থাকতে এই রান্না করতেন। বেলাকে বললেই রান্না করে দেবে, কিন্তু বাচ্চা পেটে ওর কাছে কিছু আবদার করতে বাধে। কিংবা আবীরকে বললেও হয়, ও একটা ব্যবস্থা ঠিক করবে কিন্তু ইচ্ছা করে না।

বাবা-মা মারা গেলে বাড়ির বড় ছেলেরা আলো জ্বলা মৃত জোনাকির মতো হয়ে পড়ে। ইচ্ছা বলে কিছু থাকে না। রাশেদ সেটা ভালোই বুঝে গেছে। ও কেবল মৃদু হেসে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে,

'না, কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।'

আবীর বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঘুম পাচ্ছে ওর, রাশেদের জন্যও চিন্তা হচ্ছে। অথচ সেটা মুখে বলবে না, স্বীকার করবে না। কৌতুক করে, হেসে উড়িয়ে দেবে যেন রাশেদ মরলেও ওর কিছু আসে যায় না, সেটাই স্বাভাবিক। কিছু মানুষ এমনই, মনে সমুদ্র সমান ভালোবাসা নিয়ে ঘোরে কিন্তু প্রকাশ করাকে দুর্বলতা ভাবে।

'আমরা কোন হাসপাতালে বেলা?'

'হাসপাতালে না, তোফাজ্জুল হেলথ সেন্টার ক্লিনিকে।'

'আবার ক্লিনিকে কেন? বাড়তি খরচ।'

'আগে যদি জানতাম তুমি এত কৃপণ তোমায় বিয়ে করতাম না। ওষুধ না খেয়ে, শরীরকে কষ্ট দিয়ে টাকা বাঁচানোর শাস্তি তো পেলে, তাই না?'

'হুম, কয়দিন থাকতে হবে এখানে?'

'রক্ত আর কফ পরীক্ষা করতে দেয়া হয়েছে, সঙ্গে বুকের এক্সরে। সব রিপোর্ট হাতে আসতে দু-তিনদিন লাগবে। যদি রিপোর্ট ভালো হয়, তবে তিনদিন পরই বিদায় করে দেবে।'

'আমার মনে হয় না অতদিন লাগবে। শীত চলে গেছে, দেখো আমি সুস্থ হয়ে যাব। অযথা কাজ ফেলে এখানে শুয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।'

'আগামী দশ দিন কোনো কাজের কথা মুখেও আনবে না।'

'তুমি অযথাই আমাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করো।'

'চুপ, এ ব্যাপারে আর কোনো কথা বলবে না।'

'বোঝার চেষ্টা করো বেলা।'

'বলেছি না চুপ, চুপ মানে চুপ। আর একটা কথা বললে ঝগড়া বাধিয়ে দেব কিন্তু। সবাই বলবে তোমার বউ ঝগড়াটে, সেটা ভালো হবে?'

রাশেদ মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে,

'না, ভালো হবে না।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে। অনেক বকবক করেছো, এবার কিছু খেয়ে ওষুধ নিয়ে চুপ করে ঘুমাও। কথা না শুনলে উল্টাপাল্টা কসম দেব, বাবা-মায়ের কসম না, আজকাল বাবা-মায়ের কসমে কাজ হয় না, তাই ডাইরেক্ট ছেলে-মেয়ের কসম।'

রাশেদ হাসে, আজ আর ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই। খাবার মুখে দেয় কিন্তু স্বাদ পায় না। খেতে ভালো লাগছে না, সমস্ত মুখ তেতো হয়ে আছে। পিঠে ব্যথা আবারও বাড়ছে মনে হয়। কাশির সঙ্গে বমিও ফিরে ফিরে আসতে চাইছে। ভালো লাগছে না, কিছুই ভালো লাগছে না।

২১

রোদের মন ভীষণ খারাপ। ঘর অন্ধকার করে অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে আছে। ভাইকে ও ভালোবাসে, হয়তো বাবা-মায়ের থেকেও বেশি, কিংবা খানিক কমও হতে পারে। তবে সে ভালোবাসার গভীরতা অনেক। হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করে, অন্তর পর্যন্ত নাড়া দেয়, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়।

রোদ কল্পনা করে– খুব ছোটবেলায় বাবা না হয় রাশেদ ওকে স্কুলে নিয়ে যেত। বাবা শক্তপোক্ত মানুষ ছিলেন, আবদার করলে রাখতে চাইতেন না। নিছক ছেলেমানুষি আবদারের জন্য মাঝে মাঝে বকাও খেতে হতো। অথচ যতবার রাশেদের কাছে আবদার করেছে, ও কোনোদিন না করেনি। হোক সেটা ন্যায় কিংবা অন্যায়।

'ভাইয়া, আর হাঁটতে পারছি না।'

'হাঁটতে না পারলে কী করবি, বসবি একটু কোথাও?'

'না বসব না, কাঁধে নাও।'

'ওঠ তাহলে।'

অনেক বড়বেলায়ও রাশেদ ওকে কাঁধে নিয়েছে। ছোটবেলায় অনেক মোটাসোটা ছিল রোদ। সবাই মটু মটু করে ক্ষ্যাপাত। এত মোটা ছেলেকে কাঁধে নিতে নিশ্চয় কষ্ট হতো রাশেদের কিন্তু কোনোদিন বুঝতে দেয়নি ওকে। একবার স্কুল ফেরার পথে রোদের খুব লিচু খেতে ইচ্ছা হলো।

'ভাইয়া, লিচু খাব।'

'আচ্ছা বিকেলে কিনে দেব।'

'বিকেলে না এখনই।'

'এখন কোথায় পাব, বাড়ি ফিরে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এনে দেব, কেমন?'

'ওই যে মল্লিক কাকাদের লিচু গাছে কত লিচু। ওই লিচু এনে দাও, আমি ওই লিচু খাব, বাজারের লিচু খাব না।'

সেদিন ভাইয়ের আবদার মেটাতে গিয়ে রাশেদ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। মল্লিক কাকা বাবার কাছে নালিশ করেন। বাবার সে কী রাগ, রাগ করে রাশেদকে বাড়ি থেকে বেরই হয়ে যেতে বললেন। অথচ ও একবারের জন্য স্বীকার করল না, বললও না চুরি নয় বরং ভাইয়ের আবদার মেটানোই ছিল উদ্দেশ্য। রাশেদ আসলে এমনি, নিজে ভাঙবে, শেষ হয়ে যাবে তবু ওদের কষ্ট পেতে দেবে না। সবার জন্য খেটে মরে তবু দিন শেষে নিজের জন্য চাওয়ার কিছুই থাকে না ওর।

রোদ উঠে দাঁড়ায়। সহ্য করতে না পেরে কেঁদে ফেলে। জায়নামাজ নিয়ে বসে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে। আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া চায়, প্রার্থনা করে।

'আল্লাহ, ভাইয়াকে তুমি ভালো করে দাও, আমার জীবন নিয়ে হলেও ভালো করে দাও। তুমি তো সব পারো, তুমি তো করুণাময়। তোমার করুণার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকতে পারে না। সেই করুণা দিয়ে হলেও তুমি ভাইয়াকে আর কষ্ট দিও না, সুস্থ করে দাও।'

মোনাজাত শেষে রোদ বাইরে বের হয়। ওর ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বেলা এ বাড়িতে আসার পর থেকে কোনোদিন বাড়ি ফাঁকা মনে হয়নি, আজ হচ্ছে। আজ কেউ বাড়িতে নেই, কেবল ও একা। কিছুই ভালো লাগছে না। মাথা নিচু করে চুপ করে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে। কতক্ষণ এভাবে বসে ছিল কে জানে!!

'রোদ, এই রোদ।'

রোদ মাথা তুলে তাকায়। মায়া দাঁড়িয়ে আছে।

'ভাইয়া কেমন আছে রোদ?'

'আগের চেয়ে একটু ভালো।'

'যাক ভগবান বাঁচা গেল। ডাক্তার কী বললেন?'

'অনেকগুলো টেস্ট দিয়েছেন। রিপোর্ট পেলে জানা যাবে কিসের সমস্যা।'

'মন খারাপ করে বসে আছিস কেন বল তো, মানুষ কী সারাবছরই সুস্থ থাকে নাকি, অসুস্থ তো হতেই পারে।'

'হুম।'

হুম বলে রোদ চুপ করে বসেই থাকে, কথা বলে না। মায়া একের পর এক নানান প্রশ্ন করে। রোদ কোনো উত্তর দেয় না। মনের মেঘে রোদ চাপা পড়ে, আর সহ্য করতে না পেরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। মায়া ওকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়, লাভ হয় না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই যায়। মায়ার সব সহ্য হয়,

কান্না সহ্য হয় না। ও নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে। ওকে শক্ত হতে হবে, নিজে শক্ত না হলে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়া যায় না। এই মুহূর্তে রোদের ওকে দরকার, খুব দরকার।

'কাঁদিস না পাগল ছেলে। কিচ্ছু হবে না ভাইয়ার, জ্বরে কারো কিছু হয় নাকি?'

'জ্বর না রে মায়া, ভাইয়ার শার্টে রক্ত লেগে ছিল। কাশির সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে। আমার খুব ভয় করছে, ভাইয়ার যদি খারাপ কিছু হয়। আমি সহ্য করতে পারব না, আমিও হয়তো মরে যাব।'

'দেখিস কিচ্ছু হবে না ভাইয়ার। বিকেলে গিয়ে দেখবি ভাইয়া সুস্থ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেঙে পড়িস না, তুই ভেঙে পড়লে ভাবীর কী হবে ভাব তো। ভাবী তো মেয়ে, গর্ভবতী অবস্থায় এমনি মেয়েরা হতাশায় ভোগে। একদম কাঁদবি না, ঠিক আছে?'

রোদ মুখে কিছু বলে না, কেবল মাথা ঝাঁকায়। মায়া ওর চোখের পানি মুছে দেয়। রোদ কান্না থামানোর চেষ্টা করেও পারে না। আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, কাঁদতেই থাকে। মায়া ওকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে, হাল ছাড়ে না। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের কান্নারও ভাটা পড়ে।

'কিছু খেয়েছিস রোদ?'

রোদ চোখ মুছতে মুছতে বলে,

'না, খাব না।'

'চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'আমাদের ওখানে, খাবি চল।'

'না যাব না, খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা হচ্ছে না বললে হবে না, খেতে হবে। না খেলে অসুস্থ হয়ে যাবি তো।'

'বললাম না খিদে নেই।'

'পাগলামী করিস না রোদ। একসঙ্গে দুজন অসুস্থ হলে ভাবীর কী হবে ভাব তো, ওঠ বলছি, ওঠ ওঠ।'

মায়া হাত ধরে রোদকে টেনে তোলে। রোদ পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে চারপাশে তাকায়। শীত চলে গেছে, রোদ্দুরে ঝকঝক করছে চারিদিক। বসন্তের কোকিল ডাকছে অথচ মন ভালো হচ্ছে না।

'মায়া।'

'হুম বল।'

'আমি লেখাপড়া করি না বলে তোদের সবার অনেক কষ্ট হয়, চিন্তা হয়, তাই না?'

'হঠাৎ এসব কথা কেন?'

'রাতে জ্বরের ঘোরে ভাইয়া আবোল-তাবোল বকছিল তো, তাই মনে হলো।'

'কী বলছিল?'

'মা, রোদকে এত বলি পড়তে চায় না, রোদের লেখাপড়ায় মন নেই। আবার বলছিল, ওর আর তোমার বই প্রকাশ হবে। ও ভালোয় ভালোয় পাস করলে চিন্তা যায়, এসব।'

'জ্বরের ঘোরের কথায় এত গুরুত্ব দিস না তো।'

'জানিস মায়া আমিও না পড়তে চাই, খুব চাই কিন্তু পারি না। এতবার নিজেকে বোঝাই পড়তে হবে। ভালো রেজাল্ট করতে হবে, তাও হতে চায় না। তোরা ভাবিস আমি ইচ্ছা করে এমন করি, পড়ি না। আমার সামর্থ্যে নেই। আমি কতভাবে চেষ্টা করি, না পারলে কী করব বল?'

'দেখ রোদ, কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই সবকিছু না। তুই ভালো কবিতা লিখিস, ভালো আঁকতেও পারিস। কয়জন পারে এত সুন্দর করে লিখতে, কয়জন পারে এমন ভাবতে? আজ পর্যন্ত যতজনকে পড়িয়েছিস, তাঁরা সবাই তোর ক্লাস করায় মুগ্ধ, তোর ক্লাস বারবার করতে চেয়েছে। তুই শিক্ষক হিসেবে নিশ্চয় অনেক ভালো। তোর সমস্যা হলো, তুই খাতায় অন্যদের মতো মুখস্থ বিদ্যা লিখতে পারিস না। অথচ রাজনীতি, গণিত, পরিবেশ, কিংবা ভূগোলে তোর যে জ্ঞান, বিস্তর চিন্তাভাবনা, ব্যাপক পড়াশোনা, অবাক করা জানাশোনা, কয়জন পারে এমন, বল তো? তুই আমার দেখা সেরা মেধাবীদের একজন রোদ, এবং আমি খুব খুব খুব খুশি কারণ আমার মতে, আমার রোদ এই গ্রহের সেরা মেধাবীদের একজন। এবং আমি আরো খুশি কারণ আমার রোদ শুধু মেধাবীই নয়, ও খুব ভালো একজন মানুষ যার মন আকাশের সমান বড়।'

রোদ মায়ার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসে। মায়াকে রোজ মাস্তান মাস্তান লাগে। আজ প্রথমবারের মতো মায়াকে মায়াবিনী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মেয়েটার জন্য যুদ্ধ করা চলে। তাকে ভালোবেসে হেসে হেসে একটা জীবন অনায়াসে দিয়ে দেয়া যায়। মায়া রোদের হাত ধরে ওকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়, বসিয়ে খাওয়ায়। ইলা মিত্র অবাক হয়ে ওদের দেখেও চুপচাপ থাকেন।

কিছু বলতে চান কিন্তু কী বলবেন বুঝতে পারেন না। রোদের কাছে রাশেদের খোঁজ করেন, সান্ত্বনা দেন রোদকে। রাশেদকে ছাপিয়ে মনের ভেতরে মায়ার জন্যই চিন্তা ঘুরে-ফিরে আসে। ওদের অবাধ চলাচল থামাতে হবে কিন্তু কীভাবে থামাবেন বুঝতে পারেন না। ইলা মিত্র নিজের ঘরে গিয়ে বসেন। ঘাড়ের পেছনে আবার চিনচিন করে ব্যথা শুরু হয়। মায়ার পাগলামীর কাছে তিনি হেরে যাচ্ছেন। মায়ার সঙ্গে কথা বলবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন, আজই। নিজেকে প্রস্তুত করেন ইলা মিত্র। ধর্মকে বাঁচাতেই হবে তাঁকে, বাঁচাতে হবে অনিয়মকে।

২২

ইলা মিত্র মায়াকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মায়া মায়ের ঘরে এদিক-ওদিক হাঁটছে আর গুনগুন করছে। মা কিছুই বলছেন না। কেবল একটু পরপর কান চুলকাচ্ছেন আর মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। মায়ার ধৈর্য কম, মায়ের চুপ থাকা ওর ভালো লাগে না। অস্বস্তি আর অধৈর্য নিয়ে বলে,

'মা, ডেকেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাড়াতাড়ি বলো না, আমি রোদের সঙ্গে ভাইয়াকে দেখতে যাব।'

'দেখতে যে যাবে, অনুমতি নিয়েছ, বাবার কাছে বা আমার কাছে?'

'না।'

'নেয়া উচিত ছিল না? বাবা-মা হিসেবে এটুকু সম্মান তো আমরা আশা করি, তাই না?'

মায়ার মন খারাপ হয়। মাকে এসে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলে,

'হুম, তা করো। আমার অনুমতি নেয়া উচিত ছিল। লক্ষ্মী মা আমার আমি খুব দুঃখিত।'

ইলা মিত্র নড়ে-চড়ে বসেন। তিনি প্রস্তুতি পর্ব শেষ করেছেন। পুরোপুরি গুছিয়ে উঠতে পেরেছেন কিনা বুঝতে পারেন না। খুব স্বাভাবিকভাবে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আগেই রাগ দিয়ে শুরু করলেন। মায়ার সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলতে হবে, ফেরাতে হবে ওকে। বোঝাতে হবে, ও যা করছে তা ভুল। এমনিতে তিনি প্রচণ্ড ধৈর্যশীল, কেবল মেয়ের সঙ্গে রোজ রোজ খুনসুটি লেগেই থাকে। যেন মেয়ে নয়, একই ক্লাসে পেছনের বেঞ্চে বসা দুই মেয়ে বন্ধুর রোজকার রুটিন। ঝগড়া না করলে যাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয় না।

'রোদ কোথায়?'

'ও তো বাড়ি চলে গেছে, কিছু বলবে ওকে, ডাকব?'

'না ডাকতে হবে না।'

'তাড়াতাড়ি বলো না মা! আর অনুমতি দিয়ে দাও ভাইয়াকে দেখে আসি।'

ইলা মিত্র অনুমতি দেন না। ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ, রাগ এবং অস্থিরতা অনুভব করেন। প্রকাশ করেন না।

'তাড়াতাড়ি হবে না, তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা করতে হবে।'

'কী এমন আলোচনা বলো তো, পরে আলোচনা করলে হয় না? আগে ভাইয়াকে দেখে ঘুরে আসতাম, তারপর না হয় বলতে।'

'না এখনই বলতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ।'

'হুম বলো।'

'তোমাকে আমরা তোমার পিসির বাড়ি পাঠিয়ে দেব ভাবছি।'

মায়া অবাক হয়ে মায়ের চোখে তাকায়। মায়ের কণ্ঠ ভারী ভারী, তাঁকে এমন স্বরে কথা বলতে দেখা মায়ার কাছে নতুন।

'মানে কী?'

'মানে তুমি এখন থেকে পিসির বাসায় থাকবে, ওখান থেকে ক্লাস করবে। এখান থেকে তোমার ক্লাস করতে কষ্ট হয়ে যায়।'

'ক্লাস করতে কষ্ট হয় আমি বলেছি কখনো? আজব তো, আমাকে না শুনে হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে মা, কেমন করে?'

'কেন, তোমার ভালো-মন্দ সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারব না?'

'পারবে, অবশ্যই পারবে। পারবে না কেন, তোমরা আমার বাবা-মা। তোমরা আমার অভিভাবক কিন্তু যে সিদ্ধান্ত আমার জন্য নিচ্ছ, সেখানে আমার মত নেয়া অবশ্যই উচিত ছিল। আমি বড় হয়েছি।'

ইলা মিত্র অধৈর্য হয়ে পড়েন।

'তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে তুমি তোমার পিসির বাড়ি যাচ্ছ, ওখানে থাকছ।'

'সিদ্ধান্ত তো নিয়েই ফেলেছ, তাহলে তো আর আলোচনা থাকল না, তাই না?'

'তোমার বয়স কম, তাই তোমার ভালো-মন্দ আমরা একসঙ্গে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আমি যাব না। আমি বাড়ি ছাড়া থাকতে পারি না মা, তুমি ভালো করেই জানো।'

'আমার যা বলার তা আমি বলেছি।'

‘এভাবে বললে তো হবে না মা, বোঝ না কেন? আর আমার নিজের বাড়ি থাকতে আমি পরের বাড়িতে থাকব কেন?’

‘নিজের পিসি পর হয়ে গেল আর আপন হলো রাশেদ, রোদ ওরা? যে হাসপাতালে ছুটে যাচ্ছ, কাউকে কিছু না বলে।’

‘কিসের মধ্যে কী মেশাচ্ছো মা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘তোমাকে কিচ্ছু বুঝতে হবে না, তুমি হাসপাতালে কাউকে দেখতে যাচ্ছ না।’

‘মা ভাইয়া অসুস্থ।’

‘ওরা অসুস্থ হলে আমাদের কী, মরলেই কী?’

মায়া অবাক হয়ে মাকে দেখে, পরিচিত মাকে অপরিচিত মনে হয়।

‘মা, ভাইয়া না তোমার ছেলে, তুমি কতবার বলো এ কথা।’

‘কেউ আমার ছেলে-টেলে না। আমার সন্তান কেবল তুমি এবং তোমার ভালোর জন্য আমরা যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি।’

‘এ কেমন কথা মা?’

‘শুনতে যেমনই লাগুক এটাই ঠিক কথা।’

‘মা তুমি বোঝার চেষ্টা করো, তুমি যা...’

ইলা মিত্র অধৈর্য হয়ে পড়েন। আর নিজেকে সামলাতে পারেন না। কয়েকদিন ধরে জমে থাকা সমস্ত রাগ বিস্ফারিত হয়।

‘কী বুঝব আমি, এখানে রাখব আর তোমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুমু খাওয়া দেখব বেয়াদব মেয়ে। যা বলেছি তাই, তুমি তোমার পিসির বাড়ি থাকবে সেটাই শেষ কথা। কোনো ক্লাস করতে হবে না তোমাকে। কেবল পরীক্ষার সময় গিয়ে পরীক্ষা দেবে। তোমার আর কোনো নোংরামি সহ্য করব না আমি।’

মায়া অবাক হয়। লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ফিসফিস করে বলে,

‘আমি নোংরামি করিনি মা, আমরা দু’জন দু’জনকে ভালোবাসি, আমরা বিয়ে করব।’

মায়ার কথা শেষ হয় না। তার আগেই বিশাল এক চড় ওর মুখে এসে লাগে। মায়া প্রস্তুত ছিল না। বিছানা থেকে ছিটকে নিচে পড়ে।

‘নির্লজ্জ মেয়ে, জানোয়ার পেটে ধরেছিলাম আমি। মা-বাবার সামনে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেই ভদ্রতাটুকুও নেই।’

মায়া মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড রাগ নিয়ে ঝড়ের গতিতে বের হতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা খায়।

ইলা মিত্র নিজেও ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়ছিলেন। চড় দেয়ার পরপর রাগ নামতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাগ আতঙ্কে পরিণত হতে থাকে। বিশাল ভুল করে ফেলেছেন তিনি। জেদি মেয়েকে এভাবে থাপ্পড় দেয়া একদম উচিত হয়নি। কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতে পারে ও, বিশাল খারাপ কিছু।

২৩

মায়া ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে, থাপ্পড় খেয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রচণ্ড অভিমান, রাগ এবং জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা হচ্ছে। বেঁচে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সব তছনছ করে দিতে।

মায়া ভেবে চলে, শেষ কবে বাবা বা মায়ের হাতে মার খেয়েছিল মনে করার চেষ্টা করে, মনে পড়ে না। রোজ রোজ খুনসুটি লেগেই থাকে মায়ের সঙ্গে। তাই বলে কোনোদিন গায়ে হাত তোলেনি। সন্তান হিসেবে এতই কী খারাপ ও, যে জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করতে হবে!

মায়ার বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। মাকে কঠিন শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে। তাঁকে কঠিন শিক্ষা দেয়ার একটাই উপায় নিজেকে শেষ করে ফেলা। একজন মায়ের জন্য এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কিইবা হতে পারে।

মায়া নিজেকে প্রস্তুত করে। পৃথিবীর প্রতি অভিমান বাড়তে থাকে। সবকিছু হঠাৎ শূন্য মনে হয়। নিজেকে শেষ করার ছেলেমানুষি খেলায় পা বাড়ায় ও। পৃথিবী ওর জন্য কতটা আবেগ, ভালোবাসা জমা রেখেছে, সেসব ভেবেও দেখে না। কেবল একটা কথাই বারবার অবচেতন মনে ফিরে আসে। শেষ করে দাও নিজেকে, শেষ করে দাও।

হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। আবীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ শুকনো, চোখের নিচে কালি।

'মায়া একটু খেতে দিবি?'

মায়া ফিরে তাকায় কিন্তু কথা বলে না।

'সে কী, কাঁদছিস কেন মায়া?'

মায়া দ্রুত চোখ মুছতে মুছতে কান্না লুকানোর চেষ্টা করে।

'কই কাঁদছি না তো।'

কাঁদছি না বলে মায়া আবার কাঁদে। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার কষ্টের কাছে অন্য সব কষ্ট নগণ্য।

‘কী হয়েছে, ম্যাথমেটিশিয়ানের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? কী যেন বলে ইংরেজিতে? ও মনে পড়েছে, ব্রেক-আপ... ব্রেক-আপ...। ব্রেক-আপ হয়েছে রোদের সঙ্গে?’

‘আজেবাজে কথা বলিস না তো, মা তোকে পাঠিয়েছে না?’

আবীর মিথ্যা বলে, স্বীকার করে না। ইলা মিত্র মেয়েকে থাপ্পড় দিয়ে শান্তি পাচ্ছিলেন না, অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। আসলে আবীরকে তিনিই পাঠিয়েছেন। উল্টাপাল্টা কিছু যেন করে না বসে, সে ব্যাপারে বোঝানোর জন্য।

‘আরে নাহ কেউ পাঠায়নি, খুব ক্ষুধা লেগেছে বুঝলি। কাকী অবশ্য আগের দিন বলেছে আর যেন কোনোদিন না আসি।’

‘তো কেন এসেছিস, আর আসিস না এ বাড়ি। এটা কোনো মানুষের বাড়ি না, এই বাড়িতে কোনো মানুষকে সম্মান করা হয় না। এই বাড়ি একজন অভিনেত্রীর, বাহ্যিক সত্য দিয়ে মোড়ানো মিথ্যা পরিবার এটা।’

‘হু তা ঠিক বলেছিস, এটা আমিও খেয়াল করেছি।’

‘দাদা।’

‘বল।’

‘আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

‘কী সিদ্ধান্ত?’

‘আত্মহত্যা করব, আজই।’

‘ওয়াইজ ডিসিশন কিন্তু কীভাবে করবি?’

‘এখনো জানি না। ছাদ থেকে লাফ দেব কিংবা ঘুমের ওষুধ খাব, না হয় ফাঁস নেব। তুই এখন যা।’

‘সে যাচ্ছি, কিন্তু হঠাৎ মরবি কেন?’

‘বেঁচে থেকে কী করব, মরলে একটা জানোয়ার কমবে। বাবার খরচ খানিক কমবে।’

‘এটা ঠিক বলেছিস, কিন্তু তোর গালে দাগ কিসের?’

মায়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বেঁচে থাকার আগ্রহ আরো একবার কমে, অভিমান বেড়ে যায়।

‘মা মেরেছে।’

‘সাবাস, কাকী তো দেখছি পুরা বাঘের বেটি। দেখে পাটকাঠি লাগে, গায়ে তো ভালোই জোর। এত জোর তা তো জানতাম না রে মায়া। মনে হয় তুইও জানতি না। পুরা পাঁচ আঙুল বসে গেছে, আজকাল হরলিক্স-টরলিক্স খাচ্ছে নাকি?’

'তুই আমার সঙ্গে ফাজলামো করছিস?'

'আরে নাহ, সে সাহস আমার আছে নাকি। ডেকে ষাঁড় গোয়ালার পালায়। অত বোকা আমি না, তাছাড়া একটু পর তোর উইকেট পড়ে যাবে, তোর সঙ্গে ফাজলামি করা নৈতিকভাবেও ঠিক হবে না।'

'তুই যা তো আমার সামনে থেকে।'

'আচ্ছা যাচ্ছি, শুধু তোর প্ল্যান শুনে যাই।'

'আমি মরে যাব সেটা নিয়েও তুই ইয়ার্কি করবি দাদা? এক মায়ের পেটে জন্মায়নি বলে কি বোন হতে পারলাম না? ন্যূনতম মানবতাটুকু দেখাবি না?'

মায়া হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। খুব কষ্টে বুক ফেটে যায়। আবীরের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হয়। মৃত্যুর আগে আগে কঠিন অভিশাপ দিয়ে যেতে ইচ্ছা করে ওকে।

'তুই অযথাই আমায় ভুল বুঝছিস। শেষ একটা কথা বলে চলে যাই। কাজ তো দিলি বাড়িয়ে, গিয়ে তো আবার তোর চিতা তৈরি করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'বল, কী বলবি।'

'তোর মতে উপায় তিনটা। এক ছাদ থেকে লাফ দেয়া। যদি ছাদ থেকে লাফ দিস, তবে বড়জোর হাত-পা ভাঙতে পারে। সর্বোচ্চ বড় ধরনের পঙ্গু হবি। এটা ঘটলে বিশাল ক্ষতি হবে। কারণ কিছুদিন পর তুইও সুস্থ হয়ে উঠবি। রোদও ল্যাংড়া মেয়েকে বাদ দিয়ে আরেকটা প্রেম করবে, বিয়ে করবে। আমও যাবে, ছালাও যাবে।'

'রোদ তোর মতো নোংরা না।'

'আচ্ছা মানছি নোংরা না। তবে এটা তো মানছিস ছাদ থেকে লাফালে না মরার চান্স শতকরা আশি শতাংশ। মরতেও ভাগ্য লাগে ঠিক কিনা?'

মায়া কোনো কথা বলে না। আবীর খানিক থেমে বলে চলে।

'ঘুমের ওষুধ খেতে পারিস বা গলায় ফাঁস নেয়া যায়। ঘুমের ওষুধ সময়সাপেক্ষ, মরতে প্রচুর সময় লাগবে। আমার মতে বেস্ট অপশন গলায় ফাঁস, কিন্তু দড়ি কি আছে?'

'দড়ি লাগবে না, মার শাড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ব। মরার আগে শেষ ইচ্ছাতে লিখব, এই শাড়ি চিরজীবন যেন মা পরে থাকে। সত্যি মরব আমি, তুই চলে গেলেই মরব।'

'ফাঁস নিলে মরতে তিন মিনিটের মতো লাগবে, বুঝলি?'

'হুম, লাগুক।'

‘এখনই মরবি?’

‘হুম।’

‘আচ্ছা মর, আমি উঠি তাহলে, বিদায়।’

মায়ার বিশ্বাস হতে চায় না আবীর সত্যি চলে যাচ্ছে। জীবন-মরণ সমস্যা দেখলে অপরিচিত মানুষও এগিয়ে আসত অথচ যাকে ভাই বলে জেনেছে, সে এভাবে বোনকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। মানুষ এত নিষ্ঠুরও হয়!

‘তুই সত্যি একটা কুত্তা দাদা, তোকে কুত্তা বললে কুকুরকে ছোট করা হয়। কুকুরের হৃদয় আছে, তোর তাও নেই।’

‘এইটা ঠিক বলেছিস, এটা না আমিও খেয়াল করেছি।’

মায়ার খুব কষ্ট হয়। হাউমাউ করে কাঁদে। আবীরকে অভিশাপ দিতে গিয়েও প্রচণ্ড ঘৃণায় দিতে পারে না। আবীর দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসতে আসতে বলে,

‘মায়া আরেকটা কথা।’

‘কী বলবি বলে চলে যা।’

‘চার নম্বর অপশন একটা আছে, শুনবি?’

‘না শুনব না।’

‘আহা শোন না, না শুনে মরলে পরকাল পর্যন্ত আফসোস করবি। কৌতূহল নিয়ে মরার দরকার কী?’

‘বল।’

‘তিন মিনিটে যখন মরতে পারবিই, তখন ওটা আপাতত পেন্ডিং রাখতে পারিস। তুই মরলে দুটো পাখি উড়ে যাবে। এটা তো মানিস, নাকি?’

‘দুটো পাখি মানে?’

‘এক তোর প্রাণ পাখি, দুই রোদ পাখি। তার চেয়ে বরং শেষ পর্যন্ত চেষ্টা কর।’

‘কিসের চেষ্টা?’

‘মানে এখনই মরার দরকার নেই। এক-দুইটা চড় খেলে কিছু হয় নাকি? ভালোবাসার জন্য মানুষ সুদূর চীন দেশে যায়, তুই সামান্য একটা চড় হজম করতে পারবি না? কি পারবি না?’

‘না পারব না।’

‘আমার তো মনে হয় পারবি।’

‘তুই আমাকে কী করতে বলিস?’

‘আপাতত চেপে যেতে বলি। ধৈর্য ধর, কয়টা দিন যেতে দে কাকী একাই

চুপ হয়ে যাবে। এর মাঝে রোদের সঙ্গে বেশি কথা বলার দরকার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তো দেখা হবেই। লেখাপড়া শেষ কর, যত বয়স বাড়বে তোর প্রতি কাকা-কাকীর ছড়ি ঘোরানো তত কমবে। তোর রেজাল্ট কী? পজিশন কত?'

'ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড।'

'কমন সেন্স বলছে তোর চাকরি না হলে বিয়ে দেবে না। চাকরি হলে রোদ, সূর্য, সাগর, নদী, গাছ যাকেই বিয়ে করিস, তখন কেউ বাধা দিতে চাইলেও কিছু করতে পারবে না, দু'দিন নিন্দা করবে, তারপর একসময় ঝড় থেমে যাবে।'

'যদি না থামে?'

'সময় দিলে সুনামিও থেমে যায়, ধর্মের ঝড়ও থামবে। একান্ত না থামলে তখন ঝুলে পড়বি। তিন মিনিটেরই তো মামলা, সমস্যা তো দেখি না?'

'হুম।'

'আমার কথা কি যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ হচ্ছে।'

'তাহলে এক কাজ কর, চুপচাপ থাক, স্বাভাবিক হ। আমি বিকেলে তোকে রাশেদের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব, আচ্ছা?'

'আচ্ছা।'

'এবার যা আমার জন্য কিছু খাবার দে।'

মায়া যায় না, দাঁড়িয়ে থাকে। আবীরকে জড়িয়ে ধরে।

'আমি তোকে খুব ভালোবাসি দাদা, খুব। তোকে কুত্তা বলা ঠিক হয়নি, তুই আমায় মাফ করে দে।'

'আচ্ছা মাফ করে দিলাম।'

আবীর হেসে ফেলে। মায়ার পিঠে হাত বোলায়। মায়াকে নিয়ে আপাতত চিন্তা চলে গেছে। কাকীকেও স্বাভাবিক হতে বলতে হবে। মায়ার বিয়ের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতে হবে। বোঝাতে হবে, যে সমস্যা চার-পাঁচ বছর পরে হবে, তা নিয়ে এখনই যুদ্ধ করে রক্তাক্ত হওয়ার, ঝামেলা করার কোনো মানে হয় না।

২৪

রাশেদের ধারণা ছিল পরদিনই ও সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু আরো দু'দিন পার হলেও জ্বর-কাশি কোনোটাই ভালো হয়নি। শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং মাথা ব্যথা করে, পাশ ফিরতে কষ্ট হয়।

তিনদিন পর রাশেদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছোটে। ব্যথা কম মনে হওয়ায় উঠে বসে। বেলা মনমরা হয়ে বসে থাকে সবসময়। কেবল রাশেদ জেগে উঠলে হাসি হাসি মুখ করার চেষ্টা করে, হতে চায় না। রাশেদ বেলাকে দেখে। ওর চোখ দুটো লাল হয়ে আছে, কেঁদেছে নিশ্চয়ই।

'বেলা, পানি খাব।'

বেলা রাশেদের মুখে পানি ধরে। পানির নিজস্ব একটা স্বাদ আছে। রাশেদ সেটাও পায় না।

'কেমন লাগছে রাশেদ?'

'এখন একটু ভালো।'

শেষ তিনদিনে রাশেদ আরো শুকিয়েছে। ওকে দেখলেই মায়া হয়। সহ্য হতে চায় না, বুকের ভেতর হা হা করে ওঠে।

'তুমি কেমন আছো বেলা?'

'আমি ভালো আছি রাশেদ।'

'আমার ছেলে কেমন আছে?'

বেলা শুকনো হাসি হাসে। সে হাসিতে প্রাণ নেই। কেবল হাসতে পারা, মাংসপেশিতে টান লাগানো।

'ভালো আছে।'

'রোদ, আবীর ওরা কোথায়?'

'রোদ আর আবীর ভাইয়া বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'আর খবর সব ভালো?'

'দুইটা খবর আছে। একটা ভালো খবর, একটা খারাপ খবর, কোনটা

আগে শুনতে চাও?'

'তোমার যেটা ভালো লাগে শোনাও।'

'ভালো খবরটাই আগে শোন।'

'হুম বলো।'

'তুমি চাকরি পেয়েছো, বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাডিশনাল জেনারেল।'

রাশেদ অবাক হয়ে বেলার দিকে তাকিয়ে থাকে, বিশ্বাস হতে চায় না। কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারে না। গলার কাছে এসে সব কথা বেধে যায়, ভাষা হারিয়ে ফেলে।

'সত্যি বলছো বেলা? নাকি আমি অসুস্থ বলে খুশি করার জন্য বলছো?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি, এই নাও অ্যাপয়েনমেন্ট লেটার।'

রাশেদ চিঠিটা ভালো করে দেখে। খুশিতে মন ভরে ওঠে। বেলার হাত ধরে চুমু খায়। উঠে বসতে চায়, পারে না। বুকে তীব্র ব্যথা করে। প্রচণ্ড আনন্দের কাছে ব্যথা স্থায়ী হয় না।

'বেলা, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাদের। এবার বোধ হয় আমাদের দুঃখের দিন ফুরালো। বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না?'

'হ্যাঁ যাব, মিষ্টি নিয়ে যাব। বাবা মৌবনের দই খুব পছন্দ করেন, ওটাও নেব।'

'বাবার যে ডায়াবেটিস।'

'একবেলা একটু মিষ্টি খেলে কিছু হবে না।'

'তুমি খুশি বেলা?'

'হ্যাঁ, খুব খুশি। তোমার সাফল্যে আমার চেয়ে খুশি আর কে হতে পারে বলো তো?'

'এই জন্য কেঁদেছো?'

বেলা মাথা ঝাঁকায়।

'হ্যাঁ।'

'পাগল মেয়ে, এই জন্য কেউ কাঁদে! চোখ তো লাল হয়ে গেছে।'

'হুম।'

'এবার খারাপ খবর দাও।'

'হুম দেব, তোমার মন খারাপ হলেও দেব।'

'বেলা আজ তুমি যত খারাপ খবরই দাও আমার মন খারাপ করতে পারবে না।'

বেলা রাশেদের চুলগুলো আউলে দেয়। শুকনো হাসি হাসতে হাসতে বলে,

'আমি বিশ্বাস করি রাশেদ, পারব না।'

'হুম, বলো শুনি কী খারাপ খবর।'

'রাশেদ তোমার ফুসফুসে টিউমার ধরা পড়েছে। টিউমারের দৈর্ঘ্য তিন সেন্টিমিটারের খানিক কম। তিন সেন্টিমিটার পর্যন্ত টিউমার ভালো হয়।'

রাশেদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বেলা খুব স্বাভাবিকভাবে কথাগুলো বলে যায়। যেন টিউমার নয়, রাশেদের খুব সাধারণ জ্বর হয়েছে। তিনবেলা প্যারাসিটামল খেলেই সেরে যাবে। রাশেদ বিশ্বাস করতে পারে না, সবকিছু উল্টাপাল্টা মনে হয়। জেগে আছে নাকি ঘুমিয়ে আছে বুঝতে পারে না। চারপাশে একবার তাকিয়ে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে, পেরেও যায়।

'তার মানে ফুসফুস ক্যান্সার?'

'হ্যাঁ, বলতে পারো।'

রাশেদ বেলার কান্নার কারণ ধরতে পারে। ফাঁকা ফাঁকা লাগে নিজেকে। মনে হয় এই বিশাল পৃথিবীতে যেকোনো সুসংবাদই আর ওকে আনন্দ দিতে পারবে না। বেলা নিজেও শান্ত থাকার চেষ্টা করে। বহুবার প্রস্তুতি নেয়ার পরও অশ্রু বাঁধ ভেঙে দিতে চায়। গলার কাছটায় এসে সব কথা আটকে আসে। সমস্ত ভালোবাসা আর সাহস একসঙ্গে জড়ো করে বেলা মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে, পারে না। বুকের মধ্যে জমে থাকা হতাশার নিঃশ্বাস বের করে বেলা বলে চলে,

'রাশেদ, তোমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে তুমি ভালো হবে। টিউমার এখনো সহনীয় পর্যায়ে। তুমি যদি সাহস রাখো, নিজেকে প্রস্তুত করো অবশ্যই ক্যান্সারকে হারিয়ে দিতে পারবে। তুমি কী আমার কথা বুঝতে পারছো?'

'হুম পারছি।'

'রাশেদ তুমি আমাকে কথা দাও, তুমি বেঁচে থাকবে, হাল ছেড়ে দেবে না।'

'আমি বেঁচে থাকব, হাল ছেড়ে দেব না।'

'লক্ষ্মী ছেলে।'

বেলা হাসতে হাসতে রাশেদের মাথায় হাত বোলায়। রাশেদ নিজেও হাসতে চেষ্টা করে।

'কত টাকা লাগবে বেলা অপারেশনের জন্য?'

'ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। সব ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও,

বিশ্বাস রাখো।'

'বেলা, আমি অন্যের টাকায় চিকিৎসা করাব না।'

'তোমার টাকা কী আমার টাকা না রাশেদ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তাহলে আমার টাকাও তো তোমার টাকা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে শুনে রাখো, কারো টাকা তোমাকে নিতে হবে না। কেবল আমার বাবাই না, আমার মা-ও অনেক ধনী মানুষ ছিলেন, জানো তো?'

'হুম জানি।'

'মা আমার জন্য যা রেখে গেছেন তা দিয়ে তোমার টিউমার অন্তত পঞ্চাশবার অপারেশন করানো যাবে।'

'এটা আগে বলোনি যে।'

'আগে বললে কি যৌতুক নিতে?'

'না।'

'সেই জন্য বলিনি।'

'ওওও...'

'এখন ঘুমিয়ে যাও, একদম মন খারাপ করবে না, কোনো চিন্তা করবে না। আমি, আমরা সবসময় পাশে আছি, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

রাশেদ চোখ বন্ধ করে। বেলা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। একসময় ও চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে।

রাশেদ ঘুমিয়ে গেলে বেলা বাইরে এসে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদে, আর সহ্য করতে পারে না। মায়ের সম্পদের ব্যাপার পুরোটাই মিথ্যা। সমস্ত চিকিৎসায় অন্তত ২ লাখ টাকা খরচ হবে। এত টাকা কীভাবে জোগাড় হবে, কোথা থেকে আসবে কিছুই বুঝতে পারে না। তবে যেভাবেই হোক টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের জন্য, সন্তানদের জন্য রাশেদকে বেঁচে থাকতে হবে।

২৫

রাশেদের ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছে শোনার পর থেকে পরিচিতরা সবাই ভিড় করতে থাকে। রাশেদের শরীর দিনে দিনে আরো ভেঙে পড়ে। আগে কষ্ট করে পাশ ফিরতে পারত, ইদানীং তা-ও পারে না। সময়, দিন, তারিখ নিজের মতো বইতে থাকে, রাশেদ মনেও রাখে না। ধীরে ধীরে বেঁচে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে শুরু করে।

রাশেদের ক্যান্সারে সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়ে রোদ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ভাইয়ের মাথার পাশে বসে থাকে, সারাদিন কাঁদে। কিছু খেতে চায় না। মাঝে মাঝে রাশেদ জেগে ওঠে, খানিক কথা বলে।

'রোদ, রোদ, আছিস ভাই?'

'বলো ভাইয়া।'

'কাঁদছিস নাকি?'

'না তো?'

না তো বলে রোদ চোখ মোছে। কান্না লুকানোর চেষ্টা করে, লাভ হয় না। ফুঁপিয়ে ওঠে।

'কাঁদিস না, আমি সুস্থ হয়ে যাব, দেখিস।'

'আচ্ছা ভাইয়া।'

'আমার চাকরি হয়েছে শুনেছিস?'

'হুম শুনেছি।'

'এবার তুই টিউশনি ছেড়ে দিস, কেমন?'

'আচ্ছা ভাইয়া।'

'ভার্সিটিতে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম।'

'মিথ্যা বলছিস?'

'হুম।'

‘মিথ্যা বলতে হয় না, তুই যদি মিথ্যা বলিস সাঁঝ তো জন্ম নিয়েই মিথ্যা বলা শিখবে, তাই না?’

‘আর মিথ্যা বলব না ভাইয়া।’

‘সত্যি তো?’

‘হ্যাঁ সত্যি।’

‘তোর রেজাল্ট দিয়েছে?’

‘হ্যাঁ, সবকয়টাতে পাস করেছি। সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি।’

‘সেকেন্ড ক্লাস খারাপ না। চাকরির জন্য আলাদা পড়া। তুই বাংলায় ভালো, গণিতে ভালো, দেখবি পড়তে ভালো লাগবে, তুই ওখানে ভালো করবি। তোর চাকরি পেতে আমার মতো এত সময় লাগবে না।’

‘কী জানি।’

‘মায়ার রেজাল্ট কী?’

‘ও ফার্স্ট হয়েছে।’

‘যাক, অবশেষে ওর আশা পূরণ হলো।’

‘হুম।’

‘রোদ!’

‘বলো ভাইয়া।’

‘আমি যদি বাইচান্স মারা যাই, সাঁঝকে মানুষ করতে পারবি না?’

‘এসব কী বলছো ভাইয়া?’

‘এমনি বলছি। মরব না পাগল ছেলে, কেবল জানতে চাওয়া, পারবি না?’

‘হুম পারব।’

‘কথা দিচ্ছিস?’

‘ভাইয়া তুমি ঘুমাও।’

‘ঘুমাব, কথা দিচ্ছিস কিনা সেটা বল।’

‘হুম দিচ্ছি।’

‘তোকে বাবা ডাকা শেখাবি, কেমন? ও যেন কোনোদিন মনে না করে ওর বাবা নেই। ঠিক আছে?’

‘ঠিক আছে ভাইয়া।’

‘রোদ, আরেকটা কথা।’

‘বলো।’

‘আমি যদি মারা যাই মার পাশে কবর দিবি, বাবার পাশে দিবি না। বাবার পাশের জায়গা তোর জন্য রাখবি।’

রোদ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, সহ্য করতে পারে না।

'ভাইয়া, তুমি মরবে না, ঘুমাও তো।'

'হুম ঘুমাব। মরব না পাগল ছেলে। কেবল বলে রাখা, ঠিক আছে?'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'মার একটা কবিতা আছে না দুই ঘর নামে, যেটা পত্রিকায় ছেপেছিল?'

'হুম, আছে।'

'ওটা মনে আছে তোর?'

'শেষ দুই লাইন মনে আছে।'

'বল তো শুনি।'

'আমার তো দুই ঘর মানব আর পিশাচ, একে অন্যের সাথে করি সহবাস।'

'হ্যাঁ, ওটা। আমি মরে গেলে আমার এপিটাফে দিবি।'

'ভাইয়া, আর কথা বোলো না, ঘুমাও।'

'দিবি তো?'

'হ্যাঁ, দেব।'

রাশেদ আরো খানিক কথা বলে। এক সময় কথা বলার শক্তিটুকুও ফুরিয়ে যায়। তখন চুপ করে শুয়ে জানালা দিয়ে তাকায়। বাইরে বসন্ত, আম গাছের মকুল মৃদু বাতাসে ঝরে ঝরে পড়ে, কয়েকটা মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। নাম না জানা নীল গলার এক পাখি গাছ থেকে কী যেন খুঁটে খুঁটে খায়। মন ভালো হওয়ার কথা কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। বেঁচে থাকতে ইচ্ছা হয় না। অথচ বেলাকে ও কথা দিয়েছে বেঁচে থাকবে, হাল ছেড়ে দেবে না। দেহে পচন ধরলে মনও মরতে থাকে, কেউ বুঝতে চায় না।

রাশেদ চোখ বন্ধ করে। মাথার মধ্যে শোঁ শোঁ করে শব্দ হয়। শব্দ নিয়ে ঘুমায়, শব্দ নিয়েই জাগে। শব্দের তালে তালে মনে হয় বুকের ওপর বিশাল পা দিয়ে কেউ বসে আছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

'রাশেদ, রাশেদ।'

রাশেদ চোখ বন্ধ করেই উত্তর নেয়।

'উউউ। কে?'

'আমি বেলা, কেমন লাগছে তোমার?'

'ভালো লাগছে না বেলা।'

'হাঁ করো, এই ওষুধটা একটু খাও।'

রাশেদ বাধ্য ছেলের মতো ওষুধ মুখে নেয়। কোনো ওষুধে আর কাজ হবে না, ও বুঝে গেছে। কেবল অন্যরা বুঝতে পারছে না। সময় শেষ হয়ে আসছে,

দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। সন্তানের মুখ বুঝি আর দেখা হবে না!

একদিন গভীর রাতে রাশেদের ঘুম ভেঙে যায়। চারদিক অন্ধকার দেখে ভীষণ ভয় করে। মনে হয় ও আর বেঁচে নেই। হয়তো কবরের গহিন অন্ধকারে। এক্ষুনি মুনকার-নকির এসে হিসাব চাইবে। ও হিসাব দিতে পারবে না।

'বেলা, বেলা।'

'রাশেদ, আমি, আবীর।'

'তুমি বেলা নও?'

'আমি আবীর রাশেদ, ভাবী বাড়িতে।'

'ও, আমি ভাবলাম মারা গেছি।'

'কেমন লাগছে রাশেদ?'

রাশেদ কিছু বলে না। বারবার ভালো লাগছে না বলতে ভালো লাগে না, কেউ বুঝতে চায় না।

'কেমন লাগছে তোর?'

'খুব ভালো, চাইলে ফুটবল খেলতে পারব, খেলবি?'

রাশেদ হাসার চেষ্টা করে, পারে না। হাসি আর কাশি মিলিয়ে অদ্ভুত শব্দ হয়। আবীর ভয় পেয়ে যায়, আতঙ্কে ওর গা ভারী হয়ে আসে। রাশেদকে অপরিচিত মনে হয়।

'ঘুমা রাশেদ। কিচ্ছু হবে না তোর, তুই ঠিক হয়ে যাবি।'

'আর ঠিক হবে না, আমি বুঝতে পারছি।'

'তোর কিচ্ছু হবে না, শান্ত হ রাশেদ।'

'ভাই, আমি মারা গেলে আমার বাচ্চাকে দেখবি তো?'

'ঘুমা রাশেদ।'

'বল না, দেখবি তো?'

'হুম দেখব, এবার ঘুমা।'

'আমার ঘুমাতে খুব ভয় করছে। মনে হচ্ছে এবার ঘুমালে আর উঠতে পারব না।'

'কিচ্ছু হবে না তোর, বিশ্বাস রাখ।'

'রোদ কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে।'

'আচ্ছা ঘুমাক।'

'তুইও ঘুমা রাশেদ।'

'আবীর, আমি তোর পরিচয় কাউকে বলিনি, বেলাকেও না।'

‘জানি আমি। আর কথা বলিস না, শুয়ে থাক।’

‘আচ্ছা শুচ্ছি, ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখ নেভাস না কিন্তু।’

‘নেভাব না, তুই ঘুমের চেষ্টা কর।’

রাশেদ চোখ বন্ধ করে। অদ্ভুতভাবে নিঃশ্বাস নেয়। বুঝতে কষ্ট হয় না, ওর নিঃশ্বাস নিতে তীব্র কষ্ট হচ্ছে। আবীরের আর সহ্য হয় না। যে ছেলেটা কোনোদিন কাঁদেনি, তার চোখে পানি চলে আসে। গভীর রাতে রাশেদের পাশে রোদকে বসিয়ে রেখে ক্লিনিক থেকে বাইরে বের হয়। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে কাগজ-কলম নিয়ে বসে। কী যেন লেখে আর চোখ মোছে। লেখা বেশিদূর এগোয় না, ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। হাল ছাড়ে না ও, মোমবাতি জ্বালায়। লেখা শেষে কাগজটা বেলার ঘরের সামনে রেখে ব্যাগ কাঁধে আবার বাইরে বের হয়। সমস্ত মায়া, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে খুব ভোরে আবীর সামনে এগিয়ে চলে। পৃথিবীর বয়স বাড়ে আরো একদিন।

২৬

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় বেলার। রাশেদের জন্য চিন্তা হয়। আগের রাতে জোর করে রোদ আর আবীর ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। সারারাত মায়া বেলার পাশেই ছিল। এখনো শান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে।

বাইরে বের হতেই পায়ের কাছে নরম মতো কী একটা বাধে। এক টুকরো কাগজ জড়ো করা। আগে রোদ কবিতা লিখে এভাবে রেখে যেত। সামনাসামনি দেখাতে লজ্জা পেত। সুখের দিন ছিল, হঠাৎ সব বদলে গেল। বেলা কাগজটা খুলে দেখে আবীরের হাতের লেখা, পড়তে থাকে।

ভাবী,

অনেকক্ষণ হলো কাগজ-কলম নিয়ে চুপচাপ বসে আছি। আমি কাউকে কোনোদিন চিঠি লিখিনি, এটাই আমার প্রথম চিঠি। কীভাবে শুরু করতে হয়, কী বলতে হয় আমি জানি না। আমি চলে যাচ্ছি। রাশেদকে এভাবে দেখে আর সহ্য হচ্ছে না। ও আমার চোখের সামনে মারা যাবে আমি কিছু করতে পারব না এ আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। তোমরা আমায় ক্ষমা করো। আমি অনেক অনেক দূর চলে যাব। যেখানে পরিচিত মানুষ নেই, রাশেদ নেই, ওর খোঁজ দেয়ার মতো কেউ নেই। তোমাদের সবসময় আমাকে নিয়ে কৌতূহল ছিল, তাই না? আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, আমার কর্মকাণ্ড এসব।

জানো ভাবী, আমারো না একটা গল্প আছে। যে গল্প কেবল রাশেদ জানে আর কেউ জানে না। একটা মানুষ কতটা ভালো বন্ধু হলে সমস্ত পৃথিবীর কাছে আমাকে গোপন রাখতে পারে, তাই কেবল আমি ভাবি। আমার একটাই আফসোস, আমি কোনোদিন রাশেদের মতো হতে পারব না। আমি জানি ও আমার গল্প কাউকে বলেনি, এমনকি তোমাকেও না। আজ আমি তোমায় আমার গল্প শোনাব। যেদিন আমরা একসঙ্গে পাগলী দেখতে গেলাম তুমি হয়তো ধরতে পেরেছিলে।

আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগের কথা। দূরের এক গ্রামে এক পাগলী রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত। কেউ যদি অনুগ্রহ করে একটা-দুইটা খাবার দিত, তাই খেত। এক ভোরে পাগলীর পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। ছেলেটির বাবা কে কেউ জানত না। পাগলী দেখতে হয়তো সুন্দর ছিল, হয়তো ছিল না। পুরুষের লালসার বস্তু হতে বয়স লাগে না, চেহারা লাগে না, পোশাক লাগে না, ধর্মও লাগে না।

তুমি হয়তো এতক্ষণে বুঝে গেছ পাগলীর পুত্রসন্তান আর কেউ না, আমি নিজে। পাগলী পাগলী কেন করছি, হাজার হোক মা তো। তাঁকে বরং মা-ই ডাকি। আমার ভাসা ভাসা মনে পড়ে আজো, মা আমাকে খুব ভালোবাসত। অনেকে বহুবার আমাকে দত্তক নেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউ আমাকে স্পর্শ করতে গেলেই মা হিংস্র বাঘের মতো তেড়ে আসত। পাগলী হোক, মায়ের মন তো।

আমার বয়স তখন হয়তো পাঁচ বছর কিংবা খানিক বেশিও হতে পারে। এক বিকেলে আমার সামনেই মা গলায় ভাত বেঁধে ছটফট করতে করতে মারা যায়। তোমরা অভিযোগ করো, আমি সবসময় ধীরে ধীরে খাই, আমার খেতে অনেক সময় লাগে। জানো ভাবী, আমার জোরে খেতে ভয় লাগে। পাগলী হোক, আমি তো আমার মায়ের সন্তান, আমারো যদি খেতে গিয়ে গলায় বেঁধে যায়, আর যদি কোনোদিন না নামে।

বিরক্ত হচ্ছো ভাবী? আমার গল্প তো এখনো ঢের বাকি। এই দেখ, ইলেকট্রিসিটি আবার চলে গেল। প্রকৃতি বোধহয় চায় না আমার গল্প সবাই জানুক। প্রকৃতির পরোয়া আমি আর করি না। প্রকৃতির সঙ্গে নাকি সমঝোতা করে চলতে হয়। আর কেন? আমার বন্ধু বাঁচবে না, আমি কেন পরোয়া করব? আমি কিসের পরোয়া করব? মোমবাতি নিয়ে বসেছি, চলো আবার শুরু করি।

মা মারা যাওয়ার পর আমার স্থান হয় ওই এলাকার এতিমখানায়। এতিমখানার হুজুর জয়নাল উদ্দিন আমায় খুব ভালোবাসতেন। বড্ড ভালো লোক ছিলেন। মা বেঁচে থাকা অবস্থায় প্রায়ই আমাদের খাবার দিয়ে যেতেন। এতিমখানায় ভর্তি হওয়ার পর তাকে বাবা বলে ডাকতাম। এতিমখানায় দিন ভালোই কাটছিল। আরবির পাশাপাশি বাবা আমায় স্কুলেও ভর্তি করে দেন। আমি কোনোদিন প্রথম হতে না পারলেও লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিলাম। স্কুলের সবাই আস্তে আস্তে জেনে যায় আমার মা পাগলী ছিল, আমার কোনো বৈধ বাবা নেই। সবাই ক্লাসের বাইরে আমায় ক্ষ্যাপাত, হাসত আমায় দেখে। স্কুল দিনে দিনে আমার কাছে যন্ত্রণার নাম হয়ে পড়ে। আমি বাইরে বের হওয়া

বন্ধ করে দেই। বাবা আমাকে দেখে খুব কষ্ট পেতেন।

স্পষ্ট মনে আছে আমার। একদিন মাগরিবের নামাজ শেষে তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। ঘরের মধ্যে কেবল আমি আর বাবা। তিনি কী বললেন জানো? তিনি বললেন, 'শাহরিয়ার...,' এই রে নিজের পুরনো নাম বলে ফেললাম। আর শুনলেইবা কি! আজ তো তোমায় সব বলব। হ্যাঁ, আমার নাম শাহরিয়ার উদ্দিন ছিল। আবীর তো আমি হয়েছি আরো পরে। যাক সে কথা। আসলে আমি যাকে বাবা বলে ডাকতাম তিনিই আমার আসল বাবা। একদিন রাতে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে মা ভেজা কাপড়ে বাবার ঘরের সামনের চালায় স্থান নেয়। আমার বাবা মায়ের পাগলীত্বের সুযোগ নেয়।

ভাবী, তোমরা আমায় বহুবার বৃষ্টিতে ভিজতে ডেকেছ। আমি কোনোদিন বৃষ্টিতে ভিজিনি। তোমরা ভিজলে আমি আশপাশেও দাঁড়াইনি। আমার কেবল ভয় হতো, তোমাদের ভেজা শরীর দেখে আমার যদি বাবার মতোই লোভ হয়! আমি আমার রক্তকে বিশ্বাস করতে পারিনি ভাবী।

বটতলার পাগলীর কোনো ক্ষমতা নেই। গুজব ছড়ানোর একটাই কারণ ছিল। ক্ষমতাবান জানলে কোনো পাগলীকে ধর্ষণ হতে হবে না। তাকে দেখে মানুষ ভয় পাবে, পুরুষের লোভে পরিণত হবে না। জন্ম নেবে না নতুন কোনো আবীর।

যাহোক, বাবা আমার কাছে সব স্বীকার করেন। আমাকে এক হাজার টাকা হাতে দিয়ে বলেন, 'শাহরিয়ার, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। এই নাও এক হাজার টাকা। কাল সকালে ট্রেনে উঠে অনেক দূর চলে যাও। যেখানে তোমায় কেউ চিনবে না। লেখাপড়া ধরে রেখো, ওটা ছেড়ো না।'

ওইদিন সারারাত আমার ঘুম হয়নি। আমি সিদ্ধান্ত নেই আমি যাব না, যত কষ্টই হোক থেকে যাব। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙে চিৎকারে। আমার বাবা অপরাধবোধ নিতে পারেননি। গলায় শক্ত দড়ি পেঁচিয়ে ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেন। বাবাকে কবর দিয়ে আমি বাসি মুখে ট্রেনে উঠে পড়ি। ট্রেনে এক মা তাঁর সন্তানকে আবীর আবীর বলে ডাকছিল। আমি নিজের নাম বদলে হয়ে গেলাম আবীর।

ট্রেন থেকে নেমে পড়ি পোড়াদহ স্টেশনে। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। আমার আজো মনে পড়ে সেসব দিনের কথা। পূজার সময় ছিল, ষষ্ঠী বা সপ্তমীর দিনে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে আমি মায়াদের বাড়ির বারান্দায় বসে ছিলাম। কাকী বড্ড ভালোমানুষ। না হলে কী আর আমাকে থাকতে দেন? ভর্তিও হয়েছিলাম তাদের সন্তান পরিচয়ে। শাহরিয়ার উদ্দিন থেকে হয়ে গেলাম

আবীর মিত্র। এক সময় কাকার হাতে টান পড়ল। নিষ্ঠুর হতে বাধে ভাবী। নাম-পরিচয়হীন মানব শিশুকে থাকতে দিল, এই অনেক। পড়া ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নামলাম। তারপর একদিন তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি মারা গেল, উঠলাম এই ঘরে।

পরের গল্প তুমি তো সব জানো। ভাবী, আমার ঘরে খাটের নিচে কালো ব্যাগ রাখা। সেখানে তিন লাখ টাকা পাবে। আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় এই টাকা। আমি আশপাশের সবার কাছে টাকা পাই, তাদের ইচ্ছা করে ধার দেই। কারো কাছে ঋণী থাকলে কিছুটা দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। উল্টাপাল্টা নানান কাজ করি নিজেকে ভালো রাখতে। কেবল তোমার আর রাশেদের কাছে কোনো টাকা পাই না। এটা কিন্তু তোমাকে নিতে হবে, এটা ধার। তোমার মেয়ে সাঁঝকে বলবে চাচ্চুর এই টাকা শোধ করতে। সুদসহ ছয় লাখ দিতে হবে কিন্তু এক টাকা কম দিলেও হবে না। আমি আসব কোনোদিন এই টাকা ফেরত নিতে। আচ্ছা ভাবী, অনেক বকবক করলাম। ভোর হয়ে আসছে। আজান দেবে এখনই, আমি বের হই।

বেলা চিঠি শেষ করে। চিঠিতে কোনো বিদায় সম্বোধন নেই। ছেলেটা সারাজীবন গোমড়া মুখে কৌতুক করেছে। যাওয়ার বেলাতেও সুদ চেয়ে কৌতুক করে গেল। কত ব্যথাই না লুকিয়ে ছিল ওর সমস্ত হৃদয়জুড়ে। বেলার বড্ড খালি খালি লাগে। বুকের ভেতর হা হা করে ওঠে। চিঠি শেষ করে হাউমাউ করে কান্না শুরু করে। মনে হয় কোথাও কেউ নেই, কোথাও কিছু নেই!

পেটের ভেতর অনাগত শিশু ঠিক তখনই জোরে একটা গুঁতো দেয়। ও যেন বলতে চাইছে, 'মা, কেঁদো না। আমি আছি, আমি আছি।'

২৭

চৌধুরি ইরাজুদ্দিন বারান্দায় ইজি চেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। প্রথম সকালের মিষ্টি রোদ্দুর গায়ে এসে লাগছে। বারান্দার বাইরে উথাল-পাথাল বসন্ত। নগ্ন আমড়া গাছ আবার নতুন পাতায় সেজেছে। গত বছর আম গাছে মুকুল ছিল না। এ বছর মুকুলে ছেয়ে গেছে। মন ভালো হওয়ার কথা, অথচ ভালো লাগছে না।

ইদানীং তিনি কিছুই অনুভব করেন না। কোনো সৌন্দর্যই তাঁকে আকর্ষণ করে না। ছেলে কানাডার দর্শনীয় স্থানের ফটো পাঠিয়েছিল। তিনি প্রতিউত্তরে লিখেছেন, 'বাহ, খুব সুন্দর।' বলতে হয় তাই বলা। সৌন্দর্যের যে আকর্ষণ শক্তি, তিনি অনুভব করেননি। মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। অন্তরের চোখে ছানি পড়েছে। কোনো অপারেশনে এ ছানি দূর হবে না, তিনি বুঝে গেছেন।

রোজ রোজ বাড়িতে ভালো ভালো রান্না হয়। সবাই রান্নার সুনাম করে, চেটে-পুটে খায়। কেবল তিনিই কোনো স্বাদ অনুভব করেন না। বাইশ কিলোমিটার দূরে মেয়ে কী খাচ্ছে সেই চিন্তায় মন অস্থির হয়ে থাকে। লবণ কম মনে হয়, মসলা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লাগে। বার্ধক্যের এই বুঝি সমস্যা। মৃত্যুর আগে আগে শরীরের নানান অংশ আলাদা করে মরতে থাকে। তার শরীরেও মরণ ধরেছে, সময় বুঝি শেষ হয়ে আসছে। তিনি ভাবতে থাকেন, সমস্ত জীবনে বড় কোনো পাপ করেছেন কিনা মনে করার চেষ্টা করেন, খুঁজে পান না। কোন পাপের শাস্তি আল্লাহ দিচ্ছেন তিনি বুঝতে পারেন না।

'হেলাল, হেলাল।'

হেলাল উত্তর নেয় না। চুপচাপ পাশে এসে দাঁড়ায়।

'আজকে দুপুরের রান্না কী?'

'চিংড়ি ভর্তা আর মুরগির আলু ঘাটি।'

মুরগির আলু ঘাটি বেলা ভালো রান্না করত। রান্না করে টেবিলে বাবার জন্য আলাদা করে রেখে দিত। তিনি একটু পরপর ঘুরতেন, ফিরতেন, খেতেন। এখনো কত কী রান্না হয়। সেই স্বাদ তিনি পান না। কেউ আলাদা করে টেবিলে রাখারও প্রয়োজন মনে করে না। মেয়ের অভাব স্পষ্ট হয়।

'কোনো খবর আছে হেলাল?'

'জি কাকা, একটা ভালো খবর, একটা খারাপ খবর।'

'খারাপ খবর আগে দাও।'

'রাশেদ ভাইয়ার ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তোফাজ্জুল ক্লিনিকে ভর্তি আছেন।'

চৌধুরি ইরাজুদ্দিন অবাক হয়ে হেলালের দিকে চেয়ে থাকেন। বিশ্বাস করতে পারেন না। হেলাল অবলীলায় কথাটা বলে দিল। যেন ফুসফুসে ক্যান্সারের খবর দুপুরে খাবারের খবরের মতোই সাধারণ। গলাটা কাঁপল না, খারাপ লাগা কাজ করল না। কেবল তিনি শীতল একটা আঘাত অনুভব করলেন।

ইরাজুদ্দিন উঠে দাঁড়ান। আর চুপ থাকা চলে না। মেয়ের ঘরে এত বড় বিপদে অভিমান জমিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। বাবা হিসেবে তাঁকে মেয়ের পাশে দাঁড়াতে হবে।

'একটা ভালো খবরও আছে কাকা।'

'কোন দরকার নেই, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো।'

'আচ্ছা কাকা।'

আচ্ছা কাকা বলে হেলাল দাঁড়িয়ে থাকে, যায় না। হেলাল জানে কাকা সম্পূর্ণ কথা একবারে কোনোদিন শেষ করতে পারেন না, দুই-তিন দফা ডেকে বারবার সিদ্ধান্ত বদলান।

'হেলাল!'

'জি কাকা।'

'রাশেদের চিকিৎসা কে করছে?'

'ডাক্তার আশিক হক।'

'ডাক্তার কী বলেছেন জানো?'

'বলেছেন যদি দ্রুত অপারেশন করানো হয় সেরে উঠতে পারেন। অপারেশনে দুই লাখ টাকা খরচ হবে।'

'আর কিছু জানো?'

'না কাকা।'

'আচ্ছা যাও, ড্রাইভারকে বলো গাড়ি বের করতে।'

'আচ্ছা কাকা। কাকা, বলছিলাম একটা ভালো খবরও আছে।'

'বলেছি তো কোনো দরকার নেই, যাও।'

হেলাল ফিরে যায়। রাশেদ বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি পেয়েছে সেই ভালো খবরটি জানানো হয় না। চৌধুরি ইরাজুদ্দিন বারান্দায় পায়চারি করেন। লোকটার অস্বস্তি হচ্ছে। নিজেকে তিনি অবিশ্বাস করেন, অন্যদের চেয়েও বেশি। মনে হচ্ছে শেষ মুহূর্তে হয়তো সিদ্ধান্ত বদলে ফেলবেন। হাসপাতালে না গিয়েই ফিরে আসবেন।

'হেলাল, হেলাল।'

মাঝপথ থেকে হেলাল ফিরে এসে পাশে চুপচাপ দাঁড়ায়।

'জি কাকা।'

'আগামী তিন ঘণ্টা তোমাকে আমি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছি। আমি যদি শেষ মুহূর্তে হাসপাতালে না যেতে চাই তুমি জোর করে আমাকে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে?'

'আচ্ছা কাকা, ঠিক আছে।'

'তুমি যদি জোর করে আমাকে নিয়ে যাও তোমায় আমি দুই মাসের বেতনের টাকা বকশিশ দেব।'

'আচ্ছা।'

'আর ড্রাইভারকে বলবে গাড়ি ব্যাংক হয়ে যেতে।'

'আচ্ছা কাকা।'

'আচ্ছা কাকা বলে দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও তাড়াতাড়ি করো।'

হেলাল ড্রাইভারকে ডাকতে যায়। ইরাজুদ্দিন বহুদিন পর ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা অনুভব করেন। কিছুটা স্বস্তি ফিরে পান। রাশেদের ক্যান্সার ছাপিয়ে কেন জানি হঠাৎ ভালোলাগা কাজ করে। বহুদিন পর বেলার সঙ্গে দেখা হবে। এ আনন্দ নেহাত কম নয়। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। বেলার সঙ্গে দেখা হলে স্বাভাবিক থাকবেন। ওর কপালে চুমু খাবেন, শব্দ করে।

২৮

পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন, কুষ্টিয়া। আবীর ব্যাগ কাঁধে পুরনো একটি বেঞ্চে চুপচাপ বসে আছে। আজ থেকে বহু বছর আগে প্রথম যখন এই শহরে এলো, তখনো ঠিক এই বেঞ্চটাতেই বসে ছিল। সেদিন সবকিছু অপরিচিত ছিল, বেঞ্চ নতুন ছিল, শরীরে জ্বর ছিল। এখন সবকিছু চেনা চেনা, বেঞ্চ পুরনো, শরীর ঘুম ঘুম। মাঝে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। দূরের মানুষ কাছে এসেছে। কাছের মানুষ বৃত্তের বাইরে চলে গেছে।

আবীরের কষ্ট হয়, এই কষ্ট সময়কে অস্বীকার করার, কৃতজ্ঞতা ভুলে যাওয়ার, বন্ধুকে একা ছেড়ে পালানোর। চিত্রা এক্সপ্রেস স্টেশনে এসে থামলে আবীর উঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে একটি কম্পার্টমেন্টে চেপে বসে। ট্রেন কোথায় যাবে আবীর জানে না, ও কোথায় যাবে তাও জানে না। কেবল জানে যতদূর সম্ভব পালিয়ে যেতে হবে। এই শহর থেকে দূরে, যেখানে রাশেদ নেই, পরিচিত মানুষ নেই, ও মারা গেলে খবর দেয়ার মতো কেউ নেই। মনের মাঝে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবে বন্ধুকে। ভুল অথচ কার্যকর উপায়ে।

আবীর ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। ভোর হচ্ছে, অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। শীতল, ঠাণ্ডা বাতাস বুকে এসে লাগে। অন্য যেকোনো দিন হলে শীতল বাতাসে ঘুম এসে যেত। আজ আসছে না, অস্বস্তি হচ্ছে। এই অস্বস্তি চোরের মতো পালানোর, হারিয়ে যাওয়ার। বারবার চেষ্টা করছে সবকিছু ভুলে থাকার, সম্ভব হচ্ছে না। রাশেদের কথা মনে পড়ছে। ওর পাশ ফিরতে কষ্ট হওয়া, ওর তীব্র যন্ত্রণায় মুখ লাল হওয়া, ওর অদ্ভুত কাশি মেশানো হাসি সবকিছু একসঙ্গে চোখের সামনে ভাসছে।

আবীর ভাবতে থাকে, একবার প্রচণ্ড জ্বরে ও থরথর করে কাঁপছিল। রাশেদ সারারাত ওর মাথায় পানি ঢেলে সুস্থ করে। টিফিনে সবসময় চারটা করে রুটি নিত রাশেদ। দুটো ওকে দিত, দুটো নিজে খেত। ব্যবসা শুরুর প্রথম দিকে প্রচুর লোকসান গুনতে হয়েছিল। রাশেদ বারবার ওকে টাকা দিয়ে, পরামর্শ

দিয়ে টেনে তুলেছে। ওকে সাহস দিয়েছে, সুদিন আসবে, জীবন বদলাবে। রাশেদের কথা সত্যি হয়েছে। নানান চড়াই-উতরাই শেষে আবীরের জীবন বদলেছে। অথচ আজ সেই বন্ধুকে একা রেখে পালিয়ে যাচ্ছে, ভালোবাসা অস্বীকার করছে।

ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবীরের অস্বস্তি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। অপরাধবোধ কাজ করে। গত রাতে ও রাশেদকে কথা দিয়েছিল ওর সন্তানকে দেখবে, অথচ এভাবে পালিয়ে যাচ্ছে। বেলার কথাও বারবার মনে পড়ছে। ও কি পারবে একা ওই ভারী শরীরে রাশেদকে দেখতে, শেষ সময়ে চিকিৎসা করাতে? আবীর ভাঙতে থাকে, ভেতরের মানবতা আর পশুত্বের যুদ্ধ শুরু হয়।

আর সহ্য হয় না ওর, উঠে দাঁড়ায়। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতে না থামতে তড়িঘড়ি করে নেমে পড়ে। আবীর পালাবে না, রাশেদের পাশেই থাকবে। বন্ধুর জন্য শেষ চেষ্টা করে দেখবে। স্টেশন থেকে নেমে সোজা চলে যায় পাসপোর্ট অফিসে। মাদ্রাজের চিকিৎসা নাকি অনেক ভালো। যত দ্রুত সম্ভব রাশেদকে মাদ্রাজ নিয়ে অপারেশন করাতে হবে। বন্ধুকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করতে হবে।

২৯

রাশেদকে কড়া ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে, ও ঘুমাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে অদ্ভুতভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর কাশছে। প্রতিবার কাশির সঙ্গে সঙ্গে মুখ কুঁচকে যাচ্ছে। বলে না দিলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না ও খুব কষ্ট পাচ্ছে। মায়া রাশেদের হাত ধরে চুপচাপ বসে আছে। ওর ঠিক পাশেই বেলা। বেলার চোখে রাজ্যের শূন্যতা। রোদ আর মায়া সকাল থেকেই আবীরের খোঁজ করছিল, ও কিছু বলেনি। আবীরের চিঠি পড়ার পর, ও চলে যাওয়ার পর বেলা আরো ভেঙে পড়েছে।

আবীর হয়তো আর কোনোদিন ফিরবে না। ও এখন রাশেদকে নিয়ে কোথায় যাবে, কীভাবে যাবে তাও জানে না।

বাবার কথা খুব মনে পড়ছে আজ। বাবা পাশে থাকলে নিশ্চয় কিছু একটা করতেন, সাহস দিতেন। ওকে এত কিছু ভাবতে হতো না। ও নিজে একবার বাবার কাছে যাবে কিনা বুঝতে পারে না। মেয়ের এই দুর্দিনে নিশ্চয় তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। বেলা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। কতক্ষণ এভাবে সময় পার হয় কে জানে। বেলা শেষমেশ সিদ্ধান্ত নেয়, ও যাবে বাবার কাছে। আর দেরি করা চলে না। বেলা প্রস্তুতি নেয়, উঠে দাঁড়াতে চায় আর ঠিক তখনই হেলাল দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'হেলাল ভাই, তুমি!'

হেলাল কিছু বলে না, স্বভাবসুলভ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা খানিকক্ষণ কী যেন ভাবে। তারপর আতঙ্কগ্রস্তের মতো বলে,

'বাবার কিছু হয়নি তো হেলাল ভাই, বাবা কোথায়?'

'কাকা বাইরে আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি কি একবার আসবেন?'

বেলা তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াতে চায়, পারে না। বহুদিনের পরিচিত যে পা দুটো এতদিন দেহের সমস্ত ভার বহনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল, সে

পা দুটো আজ হঠাৎ করেই ভেঙে আসতে চাইছে। ক্লান্তিতে যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষণিকের জন্য বেলার মনে হয়, এটা যেন কেবলই স্বপ্ন অথবা ওর আবেগীয় কল্পনা।

আকস্মিক ধাক্কা কোনো মতে সামাল দিয়ে বেলা উঠে দাঁড়ায়। বাইরে বের হয়ে বাবার মুখটা দেখা মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে বহুদিনের জমানো সব অভিমান ধুয়ে-মুছে যায়। দৌড়ে বাবার ঠিক সামনে এসে অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। বাবার চোখে চোখ রাখতে চায়, পারে না। কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। ইরাজুদ্দিন মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন,

'বেলা, কেমন আছিস মা?'

বেলা কোনো উত্তর করে না, করতে পারে না। বাবার বুকের ভেতরে বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে। বাবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একগাদা আহ্লাদ মিশিয়ে বলে,

'আমার কপালে একবার চুমু দেবে বাবা, শব্দ করে? বহুদিন হলো আমার কপালে তুমি চুমু দাও না, দেবে?'

'না, কোনো কাঁদুনে বুড়িকে চুমু দিতে আমার ইচ্ছা করে না।'

কথা শেষ করে ইরাজুদ্দিন মেয়ের চোখের জল মুছে দেন। কপালে চুমু দেন শব্দ করে। ইরাজুদ্দিনের চোখ দুটোও বেলার মতো ভিজে ওঠে।

রোদে পোড়া এই পৃথিবীর বুকে কিছুক্ষণের জন্য ভালোবাসার বৃষ্টি নামে। যে বৃষ্টিতে ধুয়ে-মুছে যায় বহুদিনের জমানো অভিমান। অভিমান হেরে যায়, ভালোবাসার জয় হয়।

শেষের কথা

উন্নত চিকিৎসার কারণে এবং বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছায় রাশেদ শেষমেশ টিকে যায়। এখনো মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় ওর। প্রচণ্ড অবিশ্বাস নিয়ে চারপাশ দেখতে থাকে। বুকে ব্যথা নেই, নিঃশ্বাসে কষ্ট নেই। বেঁচে আছে ভাবতেও ভালোলাগা কাজ করে। খানিক বাদে নিজেকে ছাপিয়ে বেলার জন্য চিন্তা হয়। শেষ কয়েকমাস ক্লিনিক থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে ক্লিনিক করতে করতে একদম শুকিয়ে গেছে বেলা। সবাই মিলে বেলার বাড়তি যত্ন নেয়ার চেষ্টা করলে ও বিরক্ত হয়।

'কী মুশকিল, আমি কি রাক্ষস নাকি? এত খাবার একা খাওয়া যায়?'

হেমন্তের মাঝামাঝি বেলা মা হয়। বেলা জিতে যায়, রোদকেও হারতে হয়নি। বেলার যমজ বাচ্চা হয়। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। ওরা বাচ্চার নাম রাখে মেঘ আর সাঁঝ।

রোদ আর মায়ের বই প্রকাশ হয় ভিন্নমাত্রা থেকে। রোদ ওর বই উৎসর্গ করে মাকে। উৎসর্গপত্রে মাকে উদ্দেশ করে দুই লাইন কবিতা লেখা।

এপারেতে ঘুম ঘুম, ঘুমাও মা তবে
ওপারেতে আমাদের ফের দেখা হবে।

মায়ের বইটি উৎসর্গ করা হয় বাবার নামে। মাঝেমাঝেই ভক্তরা রোদকে চিঠি লেখে। ভক্তদের অধিকাংশই মেয়ে। তাই দেখে মায়া বিরক্ত হয়, ভালোও লাগে।

সময় বইতে থাকে। মেঘ আর সাঁঝ বড় হতে থাকে। বেলা নিজেও লেখাপড়ায় ভালো ছিল। দেরিতে হলেও ও রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগ দেয়। অফিস শেষে দুই সন্তানকে নিয়ে ওর দিন ভালোই কাটে। সন্তান, অফিসের পাশাপাশি আরো একটা কাজ মন দিয়ে করে বেলা। আবীরের জন্য মেয়ে দেখে। কাউকেই কেন জানি পছন্দ হয় না।

বেলা রোজ রোজ আবীরকে সেটা নিয়েও কথা শোনায়।

'ভাইয়া, এতগুলো বসন্ত গেল, একটা প্রেম করতে পারলে না?'

আবীর অবশ্য দুই ধর্মের বিয়ে জটিলতা সম্পর্কে জানতে প্রায়ই কোর্টে যায়। তরুণ এক নারী উকিলের সঙ্গে দেখা করে। মেয়েটার নাম শশী। তাকে দেখলেই বুকের ভেতর কোথায় যেন কেমন কেমন করে ওঠে। এটা ঠিক ভালোবাসা কিনা ও বুঝতে পারে না।

মেঘ আর সাঁঝকে নিয়ে ওর সময়টা ভালোই কাটে। যেখানেই থাক সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একগাদা চকলেট নিয়ে দ্রুত বাসায় ফিরে আসে। ওদের পড়ানোর চেষ্টা করে, লাভ হয় না। ওরা পড়তে চায় না। কী বিপদ!!

'সাঁঝ, মেঘ, আজ কিন্তু এক থেকে দশ পর্যন্ত লিখতে হবে, সঙ্গে দশটা ফুল আর দশটা ফলের নামও লিখতে হবে।'

সাঁঝ মাথা নাড়িয়ে জানায় ও রাজি না, ওর আপত্তি আছে।

'না, এক থেকে তিন পর্যন্ত লিখব। তিনটা ফুলের নাম, তিনটা ফলের নাম। আর প্রত্যেক লেখার জন্য একটা করে চকলেট।'

আবীর সাঁঝের মতোই মাথা ঝাঁকায়। ওরও আপত্তি আছে, ও রাজি না।

'না, যা বলেছি তাই, দশ পর্যন্তই লিখতে হবে। সঙ্গে দশটা ফলের নাম, দশটা ফুলের নাম লিখতে হবে। সব লিখলে একটা চকলেট পাবে, বেশি চকলেট শরীরের জন্য খারাপ, খুব খারাপ।'

'সিগারেটও শরীরের জন্য খারাপ, খুব খারাপ, তাও তো খাও। আমরা চকলেট খেলেই দোষ?'

প্রচণ্ড ভালোবাসার জন্যই হোক কিংবা অধৈর্যের কারণেই হোক আবীর শেষমেশ হাল ছেড়ে দেয়।

'ঠিক আছে, একটা কম, নয়টা করে লেখ। সব লিখলে দুটো চকলেট।'

মেঘ মুখ খোলে, সাঁঝের পক্ষ নেয়। তোতলাতে তোতলাতে বলে,

'আচ্ছা তাচ্ছু, তোমার কথাও থাক, আমাদেরও থাক। তারটা করে লিখি, তারটা লিখলে তারটা চকলেট।'

'আচ্ছা, আর কোনো কথা না, ছয়টা ফলের নাম, ছয়টা ফুলের নাম লেখো। সব লিখলে তিনটা চকলেট।'

মেঘ আর সাঁঝকে স্কুল থেকে আনা-নেয়ার কাজ মাঝেমাঝে রোদও করে। ফেরার পথে কেবল ঝামেলা বেধে যায় রোজ রোজ।

'চাচ্চু, চাচ্চু।'

'বলো মা।'

'আর হাঁটতে পারছি না।'

মেঘও সায় দেয়।

'আমিও হাঁততে পারছি না।'

'তাহলে কি একটু বসবে?'

'না কাঁধে উঠব, কাঁধে নাও।'

রোদ অভিযোগ করে না। একটু কষ্ট হলেও দু'জনকে দুই কাঁধে নিয়ে হাঁটতে থাকে। বেলা দু'জনকে একসঙ্গে কাঁধে দেখলে ভীষণ রেগে যায়। বাড়ি পৌঁছানোর ঠিক আগে আগে তাই রোদ ওদের নামিয়ে দেয়।

নানান জটিলতা সত্ত্বেও অবশেষে রোদ আর মায়ার ভালোবাসার পূর্ণতা পেয়েছিল। বিশেষ বিবাহ আইনে ওদের বিয়ে হয়, কাউকেই ধর্ম বদলাতে হয়নি।

এই উপমহাদেশে একসময় সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল, বিধবা বিবাহ অসম্ভব ছিল। জাতি হিসেবে আমরা প্রচণ্ড আধুনিক। নারী নেতৃত্ব মানতে আমাদের কষ্ট হয় না। দুই ধর্মের মিলন দেখতেও খুব বেশি খারাপ লাগার কথা নয়।

–সমাপ্ত–



এ বি এস রুমনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা কুষ্টিয়ার কইতলে। পণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে।

মূলত কবিতা লেখার মাধ্যমে লেখালেখি জীবনের হাতেখড়ি। প্রায় এক যুগ ধরে লেখালেখি করলেও পূর্বে ছাপার অক্ষরে তার কোনো বই প্রকাশ হয়নি। লেখক বদরুল মিল্লাত ও নহলী প্রকাশনীর পৃষ্ঠপোষকতায় বড় পরিসরে এটিই তার লেখা প্রথম বই। প্রকৃতিপ্রেমী এই লেখক বর্তমানে তার দ্বিতীয় উপন্যাস নিয়ে কাজ করছেন। এক জীবন লিখে যাবেন এটিই তার একমাত্র ইচ্ছা।